NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG

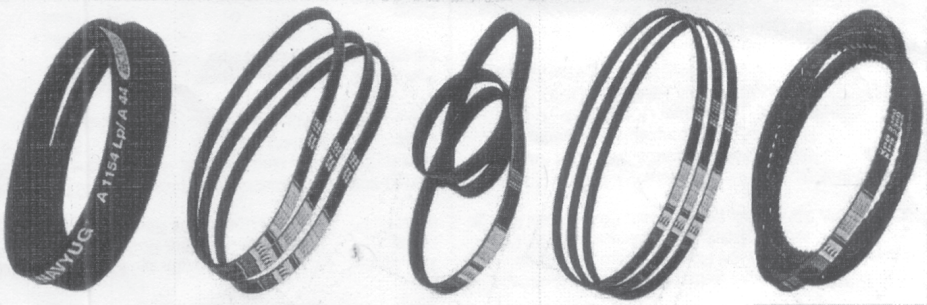

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IS : 2494
ISI
CM/L NO. 9065679

BSCIC Certifications BSCIC Private Limited.
ISO 9001:2008

RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

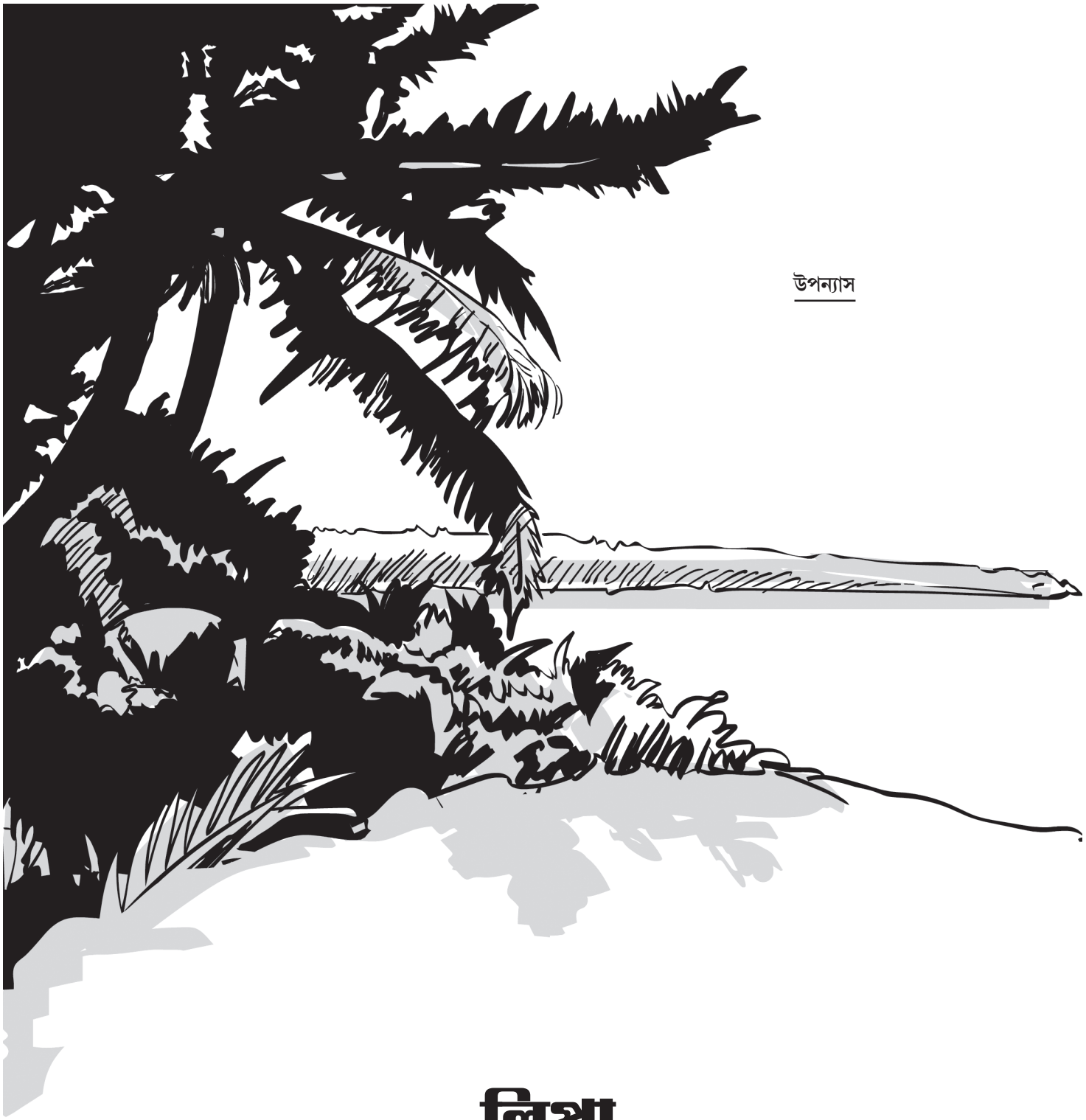

উপন্যাস

লিপা

জিষ্ণু বসু

প্রথম দৃশ্য

অ্যাবেডিন জেটি গাছের ছায়ায় একটা কাঠের বেঞ্চ। এক শ্বেতাঙ্গিণী একা বসে। একমনে তাকিয়ে আছে রস আইল্যান্ডর দিকে। একটু দূরে একজন ডাব বিক্রি করছে। একটি ভারতীয় ছেলে, পরনে জিনস্ আর টি শার্ট। ডাবওয়ালাকে বলল, ' দো দেনা আচ্ছাসা।'

'মালাই ইয়া পানি।'

'নেহি, সির্ফ পানি।' বলেই ছেলেটি একবার তাকালো বেঞ্চের দিকে। এখনও একমনে রসের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। ডাবওয়ালা দুটি কচি ডাব কেটে দেয়। স্ট্র লাগায়। ছেলেটি দু'হাতে দুটি ডাব নিয়ে এগিয়ে আসে বেঞ্চের দিকে। ডান হাতের ডাবটি মেয়েটির দিকে এগিয়ে দেয়। মেয়েটি একবার হাসে। দু'হাতে ডাবটা নেয়, অস্ফুটে বলে, 'থ্যাঙ্কস্।'

বলেই আবার তাকায় রসের দিকে। ডাবে একটা চুমুক দিয়ে ছেলেটি বলে, 'আন্দ্রেয়া, কী এত ভাবছ?'

আন্দ্রেয়া একবার ফিরে দেখে, একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'নাঃ, কিছু না।'

এবার মেয়েটি ফিরে তাকায় ছেলেটির দিকে, 'কাল আমাকে সেলুলার জেল দেখাবার সময় তোমাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে সাভারকরের সেল। ফাঁসির মঞ্চ, ফাঁসির আগে স্নানের জায়গা।' এবার একটু হাসে আন্দ্রেয়া, 'আমার তো ছাদে উঠে ভয়ই করছিল। এতদিন পরে হাতের কাছে একটা জলজ্যান্ত ইংরেজ মেয়ে পেয়ে আমাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে না ফেলে দেয়।'

সুপ্রাজ একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না, না। উত্তেজিত হব কেন?'

আন্দ্রেয়া তখনও হাসছে, 'জানো, সানফ্রানসিসকোর আলকাটরাজ জেল আর এই সেলুলার জেলের অনেক মিল আছে। দুটোই দ্বীপের মধ্যে। সেই ছোট ছোট সেল, অন্ধকার, দ্বীপের মধ্যেই অফিসারদের বিনোদনের ব্যবস্থা— সবই প্রায় এক। একটাই পার্থক্য।'

সুপ্রাজ তাকায়, 'কী পার্থক্য?'

'ওখানে যারা আলকাটরাজ বানিয়েছিল এখনও তারাই দেশ চালাচ্ছে। তাই সেখানে গাইডরা জেল কর্তৃপক্ষের প্রশংসাই করে। আর সেলুলার জেল যে কয়েদিদের জন্য বানানো হয়েছিল, সেই ভারতীয়রা আজ নিজেদের দেশ শাসন করছে। তাই সেলুলার জেলের গাইড অত্যাচারের বর্ণনাতে কোনো অংশ ছাড়ে না।'

সুপ্রাজ প্রসঙ্গ ঘোরাতে চায়, 'ছেড়ে দাও, তোমার প্ল্যান বলো। প্রফেসর লেসিং তো বলেছিলেন তোমার মাস দুয়েক লাগবে।'

আন্দ্রেয়া এবার দুষ্টুমির হাসি হাসে, 'হ্যাঁ, লেসিং তো তোমার প্রেমে পাগল। বুড়ি আমাদের এমফিলের সোস্যাল অ্যানথ্রোপলজি ক্লাসে কম করে পঞ্চাশবার বলেছে, এমনকী কম্যুনিটি যদি কেউ ঠিকঠাক বোঝে তো আমার সুপ্রাজ।'

সুপ্রাজ যেন একটু লজ্জা পায়, 'ঠিক, ম্যাডাম খুব ভালোবাসেন আমায়। একেবারে ছেলের মতো। কেমব্রিজে আমার পোস্টডকের দিনগুলো সত্যিই দারুণ ছিল। আমি গিয়েছিলাম হ্যারি ইংলন্ডের কাছে। তারপর আসলে লিসিংয়ের সঙ্গেই কাজে জুড়ে গেলাম।'

'সুপ্রাজ তুমি টিচিং ছেড়ে সরকারি মিউজিয়ামের কিউরেটর হয়েছ শুনে খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন লিসিং। ডিপার্টমেন্টের সবাই অবাক হয়েছিল।'

একটু থামল আন্দ্রেয়া। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, 'আজ বুঝেছি, তুমি ঠিকই করেছ। বিশেষত, কাল সন্ধ্যা থেকে।'

'কেন, কাল সন্ধ্যেবেলা কী হলো?' সুপ্রাজ চোখ মেরে বলল, 'কোনো হ্যান্ডসাম জারোয়া ছেলের প্রেমে পড়লে নাকি; ?'

আন্দ্রেয়া হাতে ডাবটা উঠে গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে এসে বলল, 'না, সুপ্রাজের থেকে বেশি হ্যান্ডসাম আর পোর্টব্লেয়ারে কাকে পাব?' তারপর একটু চুক চুক করে মুখে শব্দ করে বলল, 'সরি, তোমার সঙ্গে তো আমার প্রেম করা যাবে না। অ্যাকর্ডিং টু হিন্দু কাস্টমস্। তুমি তো আমার ডিপার্টমেন্টাল এলডার ব্রাদার। কী যেন বললে সেদিন, দা-দা।' বলেই হাসতে লাগল।

বেলা বাড়ছে। লোকজনের আনাগোনাও বাড়ছে জেটিতে। খাবারের সন্ধানে দুটো সিগাল সামনে ঘুরছে। আন্দ্রেয়া সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ছেলে নয়, মেয়ে। একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছি। হ্যাঁ, সে আন্দামানিজ।'

সুপ্রাজ একটা গলা খেকরি দিয়ে বলল, 'ওঃ, মেয়ে! তা ভালো।'

'তুমি লিপার নাম শুনেছ, সুপ্রাজ?'

'লিপা সেটা কে? মানে কী বস্তু? কোন জায়গা?' সুপ্রাজ ভাবছে হয়তো উচ্চারণের বিভ্রাটে এমন কোনো নতুন শব্দ বলছে আন্দ্রেয়া।

'তুমি কী ভাবছ আমি জানি। ভাবছ আমি কী শুনতে কী শুনেছি? কোনো জায়গার নাম হয়তো আমি ভুল উচ্চারণ করছি। আমি ঠিকঠাক উচ্চারণ করছি। আমি ১৯-২০ বছরের একটা মেয়ের কথা বলছি, যার নাম লিপা।'

'কে সে?'

'ওরা এক পা দু'পা করে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। গাড়িতে উঠতে উঠতে আন্দ্রেয়া বলল, 'অ্যাবেডিনের যুদ্ধ তো জানো?'

'সেটা কে না জানে? এই ডক ঘাট, এই বাজার চার রাস্তার মোড়ে বিজয়স্তম্ভ— সবই ওই যুদ্ধের নামে। অ্যাবেডিনের যুদ্ধেই ইংরেজরা জিতেছিল। তারপর থেকেই গ্রেট আন্দামানিজরা ক্রমে বিলুপ্তির পথে চলে গেল।'

'ঠিক তার সঙ্গে একটি মেয়ের নাম জড়িয়ে আছে— আচ্ছা, আজ বিকালে তুমি কখন ফ্রি হবে?'

সুপ্রাজ গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, 'আজ মিউজিয়াম বন্ধ। কিন্তু অ্যাডমিনিসট্রেটিভ কাজকর্ম আছে। আজ পাঁচটার পরে আমি প্রি। ফ্রি লাইক আ বার্ড।'

'এসো না আজকে আমার ওখানে। মনটা সত্যি খুব ভারী হয়ে আছে। একটা দারুণ জিনিস পড়াব। ঠিক অ্যানথ্রোপলজির মেটেরিয়াল হয়তো নয়, তবে গভীর জীবনবোধের পাঠ। আসবে?'

গাড়ি গেস্ট হাউসের দিকে ছুটছে, 'একজন স্বর্ণকেশী সুন্দরী তন্বী ইংরেজ দুহিতা সান্ধ্য আসরে নিমন্ত্রণ করছেন। সসেজ আর আয়রন ব্রিউ... জোরে হাসতে থাকে সুপ্রাজ।

আন্দ্রেয়া হাসে না, 'আয়রন ব্রিউ শেষ হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়ের উপরে সাজানো গেস্ট হাউস। একটা গাড়ি ঢুকল। গাড়ি পার্ক করে নামল সুপ্রাজ। গায়ে পায়জামা পাঞ্জাবি। আন্দ্রেয়া ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুপ্রাজ কাছে আসতেই বলল, 'কোথায় বসবে?'

'যেখানে বলবে। বাগানে জলপাই গাছের নীচে সুন্দর ছাতা খাটানো আছে।' আন্দ্রেয়া থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না। ওখানে হবে না। এখুনি আলো কমে আসবে। আর একটু লেখাপড়া করতে হবে।'

'আবার লেখাপড়া? ভালো মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা! গুড গার্লস গো টু হেভেন...'

আন্দ্রেয়া কথাটা ধরে নিয়ে বলল, 'অ্যান্ড ব্যাড গার্লস গো এভরিহোয়ার। জানা আছে। আপাতত আমার ঘরে চলো।'

সাজানো করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলে দুজনে। টবে ক্যাকটাস, টেরাকোটার ট্রাইবাল স্কাল্পচার, ঝোলানো পটে অর্কিড।

দরজা খোলে আন্দ্রেয়া। ঘরে ঢোকে। নীচু সেন্টার টেবিলের দুদিকে চেয়ার। সেন্টার টেবিলে ক'টা বই আর কিছু কাগজ ছড়ানো।

সুপ্রাজ একটা প্যাডক কাঠের ভারী চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, 'খিদে পেয়েছে তো! স্নেকস্ অ্যান্ড...'

'সব আসছে।' আন্দ্রেয়া একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসে।

মিনিটখানেক দুজনেই চুপ। আন্দ্রেয়া শুরু করে, 'আচ্ছা সুপ্রাজ, ভারতীয় হিসেবে কী তুমি গর্বিত?'

'অবশ্যই। সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম সব ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের প্রচুর অবদান।'

'আমিও একজন ব্রিটিশার হিসাবে অত্যন্ত গর্বিত। আমার দেশ পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা তৈরিতে অনেক অবদান রেখেছে। আজও আমি তা মনে করি।' বলেই থেমে যায় মেয়েটি। আবার কিছুক্ষণের নীরবতা।

'কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীকে সভ্য করার দায়িত্ব আমাদের কেউ দেয়নি। আর কে সভ্য, কে অসভ্য সেটা বোঝার জন্য একটা দরদি মন লাগে। কেবল কেতাবি বিদ্যাতে হয় না। কাল থেকে যেন মনে হচ্ছে যে পৃথিবীকে ভোগ করার লোভ থেকেই মানুষ এক একটা জাতির উপর এই 'অসভ্য' তকমা লাগায়। মানবিক গুণ হয়তো সভ্যদের থেকে তথাকথিত অসভ্যদের বেশি।'

কফি সঙ্গে খাবার নিয়ে এল একটি অল্পবয়সি ছেলে। আন্দ্রেয়া সুপ্রাজের পছন্দ জেনে গেছে, তবু বলল, 'একটা?'

সুপ্রাজ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'কী এমন পড়লে কাল সন্ধ্যায়? কী সেই ডিভাইন ভার্সেস?'

'ডিভাইন? হ্যা ডিভাইন বটে' আন্দ্রেয়া টেবিল থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে।

সুপ্রাজ দেখে পুরাতন একটি পত্রিকা। দ্যা লন্ডন গ্যাজেট। 'লুক ডাডা ইতিহাসটা আমাদের পূর্বপুরুষ তোমাদের থেকে অনেক ভালো লিখত। এটা ১৮৬০ সালের মার্চ মাসের। মানে সিপাহি বিদ্রোহের মাত্র তিন বছর পরে। কার্লমার্কস বা দামোদর সাভারকরের ভাষায়, দ্যা ফাস্ট ওয়ার অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স।'

তৃতীয় দৃশ্য

('বার্ডস আই ডিউতে' আন্দামান। দ্বীপ, সাগর, ম্যানগ্রোভ, জঙ্গল। ধীরে ধীরে 'জুমইন' হয়ে নেমে আসছে।)

ভাষ্য : আন্দামান। বঙ্গোপসাগরের বুকে একেবারে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপ। তার মধ্যে দুটিই সবচেয়ে বড়ো। গ্রেট আন্দামান দ্বীপটা লম্বায় ১৪০ মাইল আর চওড়ায় ২০ মাইল। মহা বিদ্রোহের পরে পরেই কয়েদিদের সংশোধনের জন্য এই আন্দামানের উপর নজর পড়ল সরকার বাহাদুরের। যেসব কয়েদিদের আনা হলো তাদের অনেকেরই ধারণা ছিল যে, এই দ্বীপটা বাঙ্গলা বা অন্ততপক্ষে বার্মার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে সাঁতরে যেতে পেরে তারা আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জঙ্গল এত ঘন যে প্রায় দুর্ভেদ্য মনে হতো। লম্বা তিরের মতো সোজা তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঠে যাওয়া গাছগুলোর গোড়া একফুটের বেশি মোটা নয়। কিন্তু পাকানো দড়ির মতো একে অপরকে জড়িয়ে উঠে গেছে উপরে। যা কিছু পাতা সব একেবারে গাছের মাথায়। আর নীচের দিকে না আছে শাখা প্রশাখা না আছে পাতা। পুরো দ্বীপটা জুড়েই মোটামুটি ৫০০ মিটার উঁচু একটা পর্বতশ্রেণী। গোটা দ্বীপেই ঘাস খুব কম। আর ভীষণ জলের অভাব। আছে শুধু ছোট ছোট খানাখন্দ। সেগুলো বর্ষাকালে ভরে যায়, তবে গরমের সময় একেবারে শুকিয়ে যায়। সেখানে কোনো বন্যপ্রাণী নেই। কেবল ইঁদুর, সাপ আর সামান্য কিছু শূকর ছাড়া। আর আছে আদিম জনজাতি। ১৭৯১ সাল থেকেই সভ্য মানুষ এদের খবর জানে। তবে এই দুধনাথ তেওয়ারি ছাড়া আর কেউ

এদের কাছ থেকে বেঁচে ফেরেনি। এখন মূলত তিনটে দ্বীপে আমরা ঘাঁটি গেড়েছি। রোজ আইল্যান্ড, চাথাম আইল্যান্ড আর ভাইপার আইল্যান্ড। এখানেই প্রায় ১৬০০ জন বিদ্রোহী সেপাইকে বন্দি করে আনা হয়েছে। জায়গাটা কয়েদিদেরও পছন্দ নয়, আর কর্তৃপক্ষেরও নয়। কয়েদিরা পালাতে গিয়ে অনেকেই হাত-পা ভেঙেছে, কেউ বা পালিয়ে যাবার পাগলামিতে নিজের জীবনটাও হারিয়েছে। জায়গাটা সত্যিই ভয়াবহ। ইউরোপীয়দের জন্য তো বটেই। এমনকী যে কোনো সভ্য মানুষের জন্য এই দ্বীপ আর জঙ্গল সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতছানি। যাই হোক, চাষবাস শুরু হয়েছে। নতুন জমিতে শশা, পালং শাক আর অপূর্ব কুমড়ো ফলেছে। গর্জন তেল হয় যে গাছ থেকে সেই ১০০ ফুট উঁচু সোজা লম্বা গাছ, কোনো শাখা প্রশাখা নেই। কেবল মাথায় পাতার বাহার। জঙ্গলের কাঠ ভীষণ শক্ত, কুড়োল একেবারে পাথরের মতো ঠিকরে আসে। সুবিধা একটাই, সাদা পিঁপড়ে গাছের ভেতর গভীর গর্ত করে ফেলেছে। তাই ভেতরে বারুদ দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া যায়। কয়েদিরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে বেতন পায়। আর বাকি ব্যবস্থা, তারা নিজেরাই করে নেয়। পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের কাছেই একটা বসতি তৈরি করাই এই ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গ্রেট আন্দামানে কয়েদিরা থাকে আর একটু দূরে সুরক্ষিত রস আইল্যান্ড হলো কর্তৃপক্ষের থাকার জায়গা। অনেকটা স্কটল্যান্ডের আরগিল সায়ারের ওবান আর কেইরার মতো পোর্ট ব্লেয়ার আর রসের দূরত্ব ৮০০ ইয়ার্ড। ভালো সাঁতার জানা কারও কাছে এই দূরত্ব অতিক্রম করা কঠিন কিছু নয়।

কয়েদিদের মধ্যে বহু জাতের লোক ছিল। বদমাশদের মধ্যে যেমন মণিপুরের যুবরাজ ছিল, এক হতভাগ্য আধা বাঙ্গালি আধা অসমিয়া ছিল, যে চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। ছিল বালান্দশাকার জমিদারবাবু যিনি এককালে সরকারকে এক লক্ষ টাকা খাজনা দিতেন। তেমন ছিলেন শাহজাহানপুরের এক ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর। সকলের জন্য এক ব্যবস্থা। কয়েদি জাহাজে ওঠার পর থেকেই সকলে জাত খুইয়েছে। কারণ, একই কল থেকে ইউরোপীয় রক্ষীদের হাতে তাদের জল খেতে হচ্ছে। তবে আন্দামানে আসার পরে হতভাগ্যদের তাদের জাতিধর্ম বজায় রাখার সুযোগ দেওয়া হতো। একজন তো আসার সময় 'সীসিকনেসের' ভান করে ডেকের দিকে আসে, তারপর অশান্ত সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যায়। কয়েদিদের চোখে, ওই লোকটি এই ভয়ানক জায়গায় না এসে পথেই আত্মহত্যা করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। এই মৃত্যু, দ্বীপে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন, মনুষ্যজগৎ থেকে বহু দূরে এই দ্বীপান্তর আর গ্রেট আন্দামান দ্বীপের ভয়ানক সব অভিজ্ঞতা একের পর এক ঘটতে থাকে। বন্দিদের কেউ কেউ কয়েক ঘণ্টার জন্য পালিয়েছিল, কেউ বা কোনোমতে দুদিন টিকে ছিল জঙ্গলে, তারপর ভয়ে ফিরে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের আবার নিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দু-তিনদিনের মধ্যে না ফিরলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হতো। এমনই একজন ফিরে আসা কয়েদি জেল সুপারকে বলেছিল যে সে জঙ্গলিদের সঙ্গে টানা দু'দিন ছিল। তবে তার বক্তব্যে এতটাই অসঙ্গতি ছিল যে সেটা বিশ্বাস করাটা বেশ কঠিন। আর সেই বর্ণনা এই দুধনাথ তেওয়ারির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আদৌ মেলে না। দুধনাথের কাহিনিতে সন্দেহের প্রায় কোনো অবকাশই নেই।

দুধনাথ তেওয়ারি, নেটিভ ইনক্যান্টির ১৪ নং রেজিমেন্টের সিপাহি ছিল। বিদ্রোহী ও বেআইনিভাবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়। ঝিলাম কমিশনে তার শাস্তি ঘোষণা হয়, যাবজ্জীবন কারাবাস। আইনের ভাষায়, 'Transportation for life and labour in iron'। তাকে ১৮৫৮ সালের ৬ এপ্রিল পোর্ট ব্লেয়ারে শাস্তির জন্য আনা হয়। মাত্র ১৭ দিনের মধ্যেই দুধনাথ রস আইল্যান্ড থেকে পালায়। তারপর ১ বছর আর ২৪ দিন আন্দামানের জঙ্গলিদের সঙ্গে থেকে ১৮৫৯ সালের ১৭ মে আবার ফিরে আসে পোর্ট ব্লেযারের কাছে আবেদিনে। সেই দুধনাথের বর্ণনা ড. ওয়কার নিজে সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। তার অনেকটা অংশই প্রকাশের যোগ্য নয়। সেগুলো কেবল ব্লু বুকেই থেকে যাবে।

চতুথ দৃশ্য

(গেস্ট হাউসের ঘর। চায়ের সরঞ্জাম, খাবার প্লেট ইত্যাদি নিতে ঢুকেছিল একটি বেলবয়। ছেলেটি সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সুপ্রাজ বলে, 'থোড়া পানি ভেজনা।' ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে, 'জী স্যার' বলে বেরিয়ে যায়।)

আন্দ্রেয়া হাসতে হাসতে বলে, 'ন্যারেশনটা একদম পারফেক্ট কলোনিয়াল রুলারদের বয়ানে। এদেশটার শাসন যেন তাদের স্বাভাবিক অধিকার। দুটো জিনিস আমার দারুণ মজা লেগেছে। একটা হলো জঙ্গলে জানোয়ার বলতে ইঁদুর, সাপ, কয়েকটা শূকর আর আদিম জনজাতি। মানে ওরা মানুষই নয়। আর মহা বিদ্রোহে ধরে আনা সবাইকে কয়েদি না বলে একেবারে 'বদমাশ' বলেছে। আমি ওই ইংরাজি শব্দটাই কখনো শুনিনি। তারপর ডিকশেনারিতে দেখলাম। এখন আর ইংরাজিতে কেউ ওটা ব্যবহার করে না। তোমরা করো।'

'কোন শব্দ? বদমাশ? আলবাত করি। বাংলা, হিন্দি সবেতেই চলে।'

আন্দ্রেয়া, 'কিন্তু ওটা ওল্ড ইংলিশ। যাক, তোমাদের দেশভক্ত

লোকদের আমরা খুব অত্যাচার করেছিলাম। সরি।'

সুপ্রাজ কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করে, 'ধুস্, এত বছর আগের তোমার দেশের কোন অত্যাচারী কী করেছিল, আর তাকে সমর্থন করে লন্ডন চেম্বারর্স গেজেট কী লিখেছিল... ছাড়ো।' একটু থেমে আবার বলে, 'আর একটা বিষয় সিপাহি বিদ্রোহের মতো বড়ো বিপ্লবের সময় অনেক ভুল লোকও স্বদেশী বিপ্লবী হিসাবে পুলিশের হাতে চলে আসে। তারা না ছিল বিপ্লবী, না ছিল দেশভক্ত।'

'আমাদের পাড়াতে এক ভদ্রলোক স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে পেনশন পেতেন। তাঁর মধ্যে কখনো দেশপ্রেমের কিছু দেখিনি। একবার কৌতূহল বশত তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, উনি কীভাবে ৪২'এর আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। অনেক খোঁচাতে শেষে বললেন, তার এক দূর সম্পর্কের জামাইবাবু মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় এসে তার বাড়িতে একরাত ছিলেন। পুলিশ পরেরদিন দুপুরে এসে সেই বিপ্লবীকে না পেয়ে আমাদের পাড়ার সেই ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আর এক রাত্রি হাজতবাসও হয়। সেই সূত্রে...'

আন্দ্রেয়া একটু অবাক হয়েই শুনছিল। খুব বেশি কিছু বুঝছিল না বলেই মনে হল।

এবার সুপ্রাজ হেসে ফেলে, 'তবে কেটা বিষয় তোমাদের দেশের লোকেরা এসেই বুঝে গিয়েছিল। সেটা হলো আমাদের আসল অসুখটা কোথায়।'

'কী আবার অসুখ?'

সুপ্রাজ জলের বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢালে। তারপর বলে, 'জাতপাত। জাতিভেদ। ওই কয়েদিদের আসল পরিচয় ভারতীয় নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জমিদার, ইনফ্রান্টির মাহার। আর এদের প্রধান দুঃখ দ্বীপান্তরের নয়, আসল দুঃখ জাত যাবার। কারণ, দ্বীপান্তর তো এক জীবনের আর জাত গেলে তো জন্ম জন্মান্তরের ক্ষতি। সত্যি সাম্রাজ্যবাদী

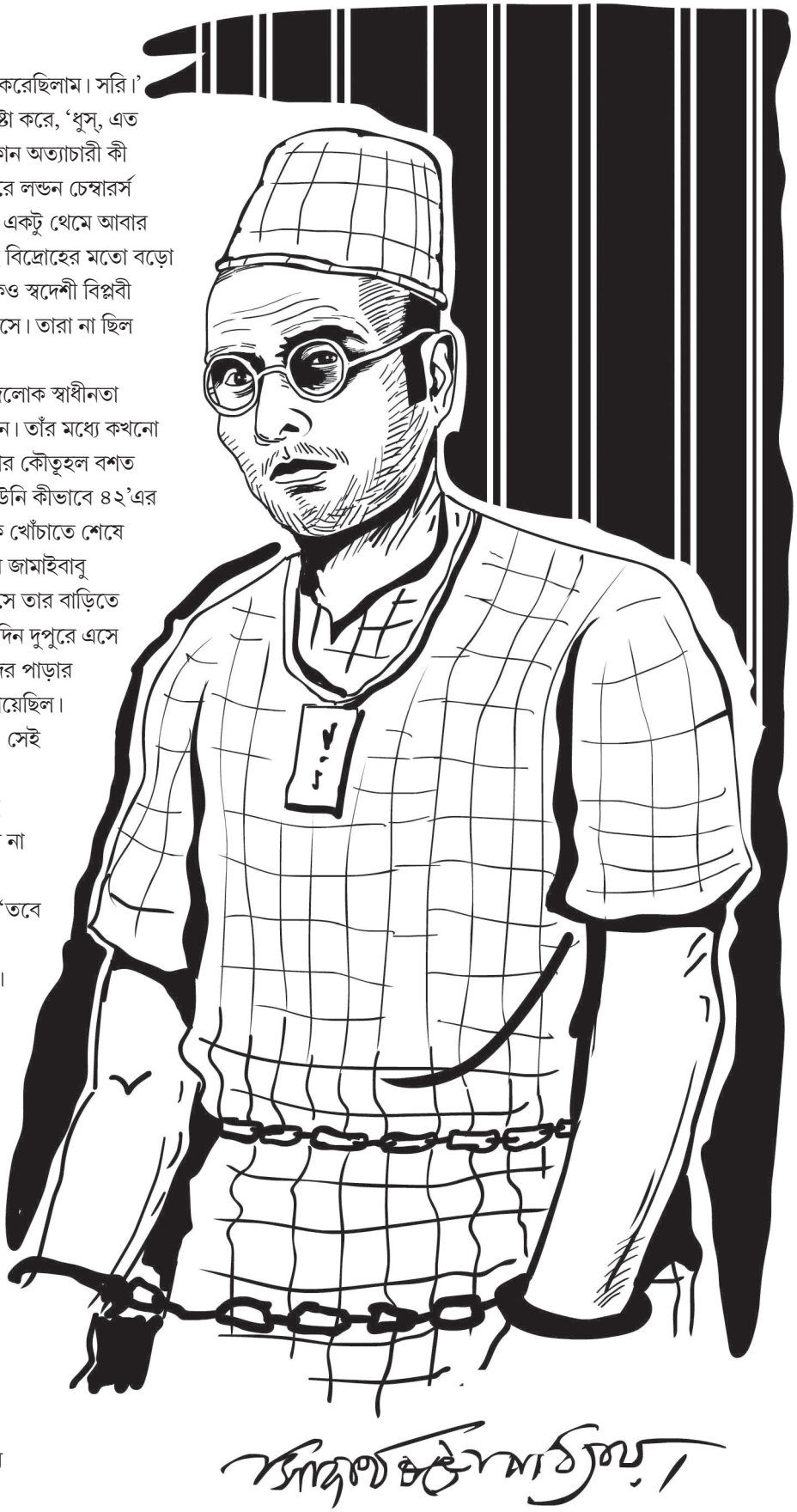

হিসাবে এই পর্যবেক্ষণটা আমার মনে হয় খুব ইন্টেলিজেন্স হয়েছে।'

'আমরা ইন্টেলিজেন্স না হলে পাঁচ হাজার বছরের একটা সভ্য জাতিকে নেটিভ বলে শাসন করা যায়।'

পঞ্চম দৃশ্য

আকাশ থেকে তোলা আন্দামানের দৃশ্য। ধীরে ধীরে নীচে এসে জঙ্গলের মধ্যে নেমে এল দৃশ্যপট।

প্রায় ১৮৪টা দ্বীপের এই দ্বীপপুঞ্জ বহুদিন থেকেই মানুষের আগ্রহের জায়গা। আন্দামান নামটাও সংস্কৃত শব্দ হনুমান থেকেই সম্ভবত এসেছে। কারণ, পঞ্চদশ শতকের ইতালীয়রা, ডাচ নাবিকরাও এই দ্বীপপুঞ্জকে ওই নামেই উল্লেখ করত। ইউরোপের মশলা ব্যবসায়ীদের কাছে ভারত আর মিয়ানমারের মাঝের এই সমুদ্রপথ খুবই আকর্ষণীয় ছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাছি পর্যন্ত ডেনমার্ক আর অস্ট্রিয়া এর দখল নিয়ে টানাটানি করত। কিন্তু সমস্যাও কম ছিল না। দক্ষিণ-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর যুগ্ম প্রভাবে কখনো কখনো সমুদ্র হয়ে উঠত অতি ভয়াবহ। কত ইউরোপীয় জাহাজ ডুবেছে এই আন্দামান সাগরে। জাহাজডুবিতে যে দু-চারজন নাবিক বেঁচে গিয়েছিল, তাদের অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ। দ্বীপগুলো আদিম জনজাতিতে ভর্তি। তারা বিদেশি সভ্য ভদ্র লোক দেখলেই বিষমাখা তির আর বর্শা নিয়ে তেড়ে আসত।

এই আদিম জনজাতিদের বেশিরভাগই নিগ্রিটো। আফ্রিকার অধিবাসীদের মতো কুচকুচে কালো। এরা এমন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে এলো কীভাবে? একটা তত্ত্ব ছিল যে, আরব দাস ব্যবসায়ীরা জাহাজে করে আফ্রিকার মানুষদের নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝপথে জাহাজডুবিতে এরা এখানে থেকে গেছে। কিন্তু জারোয়া, গ্রেট আন্দামানিজ, ওঙ্গি, সেন্টিনেলিজ— এরা নৃতাত্ত্বিকভাবেও একেবারে এক নয়। তাই জাহাজডুবির কথা সত্যি হলেও অনেকবার জাহাজডুবি হতে হবে। তাছাড়াও জারোয়াদের ব্যবহৃত শামুকের খোলা ইত্যাদির সি-১৪ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তারা আরবদের দাস ব্যবসা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ওখানে আছে। আজকের বিজ্ঞানীরা অবশ্য পরিষ্কার বলেন, গ্রেট আন্দামানিজ, ওঙ্গি, জারোয়া বা সেন্টিলেনিজরা ভারত মহাসাগরে বহু হাজার বছর ধরেই আছে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবশ্য বসবাস করত মঙ্গোলয়েড আদিম জনজাতি। নিকোবর বহুদিন দখল করে ছিল ডাচেরা। ১৮৪৫ সাল নাগাদ নেপলিয়নিক যুদ্ধে হেরে নিকোবর থেকে ডেনমার্ক পাততাড়ি গোটায়। এরপর সবক'টি দ্বীপেই ইংরেজের অধিকার।

এলাকাটাতে মাঝে মাঝেই জাহাজডুবি হয়। বিপদে পড়া জাহাজগুলোকে একটা বন্দরের সুবিধা দেবার লক্ষ্যেই ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফট্যানেন্ট ব্লেয়ার সাহেবকে সর্বপ্রথম আন্দামানে পাঠানো হয়। সাহেব আজকের পোর্টব্লেয়ারে ঘাঁটি গাড়েন বটে, তবে জনজাতিদের আক্রমণে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। বরং পোর্ট কর্নওয়ালিসের উপর ইংরেজ বেশি ভরসা করত। বার্মার যুদ্ধের সময়ও ওই বন্দরই ব্যবহার করে ইংরেজরা।

পোর্টব্লেয়ার বন্দর ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করার কথা ভাবা হলো মহা বিদ্রোহের পরে। মহা বিদ্রোহ ইংরেজ কোম্পানিকে একটা বড়সড় ধাক্কা দিয়েছিল। কানপুর রেজিমেন্টের মতো ঘটনা ইংরেজ মায়েদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বিশেষত, হেনরি নেলসনের সেই বিখ্যাত ছবি 'ইস্ট ওয়ার্ড হো', যেখানে অফিসার আর সেনাদের বৌয়েরা কোলে বাচ্চা নিয়ে জাহাজঘাটায় বিদায় দিতে এসেছে। জাহাজ ১৮৫৭ বিদ্রোহের পরে ভারতে যাবে বিদ্রোহ মোকাবিলায়। সেই সঙ্গে মার্গারেট কোয়াডের তার শাশুড়িকে লক্ষ্ণৌ থেকে লেখা চিঠি। বিদ্রোহের সময় ভারতীয় সেপাই বা অন্যান্য নেটিভদের আচরণের বর্ণনা।

তাই বিদ্রোহ শেষ হবার পরে কোম্পানি বা ইংরেজদের প্রবল হিংসা, আক্রোশ আর ঘৃণা পুঞ্জিভূত হয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। যারা মহা বিদ্রোহের সময় কোনোভাবে যুক্ত ছিল বা সহযোগিতা করেছিল, তাদের নরকে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল প্রথম কাজ। তখনই আবার মনে এল আন্দামানের কথা। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম 'স্ট্রিম ফ্রিগেট' প্রায় দুশো জন কয়েদিকে নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছাল। সঙ্গে এলেন ডক্টর জেমস্ ওয়াকার আগে দু-একটা ছাউনি গোছের কিছু ছিল কিন্তু ওই আন্দামানের ঝটপট বেড়ে ওঠা জঙ্গলের দাপটে সেগুলোকে কোনো কাজে লাগানো গেল না। বলতে গেলে প্রায় খোলা আকাশের নীচেই এনে ফেলা হয়েছিল ওই শ'দুই কয়েদিকে। ডক্টর ওয়াকার দক্ষ ছিলেন, কিন্তু অপরিণামদর্শিতা তাকে হারিয়ে দিল। প্রথম থেকেই কয়েদিরা পালাতে শুরু করল। কিছু লোকের ধারণা কিন্তু আন্দামান বার্মার সঙ্গে স্থলপথে যুক্ত। সেই আশায় পালিয়ে অনেক লোক মরল। কেউ সাপের কামড়ে, কেউ না খেতে পেয়ে, কেউ বা আদিম জনজাতিদের হাতে। যারা পালিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল তাদেরও ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হলো। এর মধ্যে আরও জাহাজ আসতে থাকল। শত শত বন্দি। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে সাল মাসে মোট সাতশো নেটিভের মধ্যে মাত্র চারশো লোক টিকল। এতদিন মহারানির চোখ পড়েছে ভারতের দিকে। ইউরোপের সব কাগজে লেখা হচ্ছে। বড্ড অত্যাচার করছে কোম্পানি। ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাছে অভিযোগ গেল ওয়াকারের নামে। ডাক্তার ওয়াকারকে একটু ধাতানো হলো। বলা হলো, কয়েদিদের মধ্যে যাদের ব্যবহার

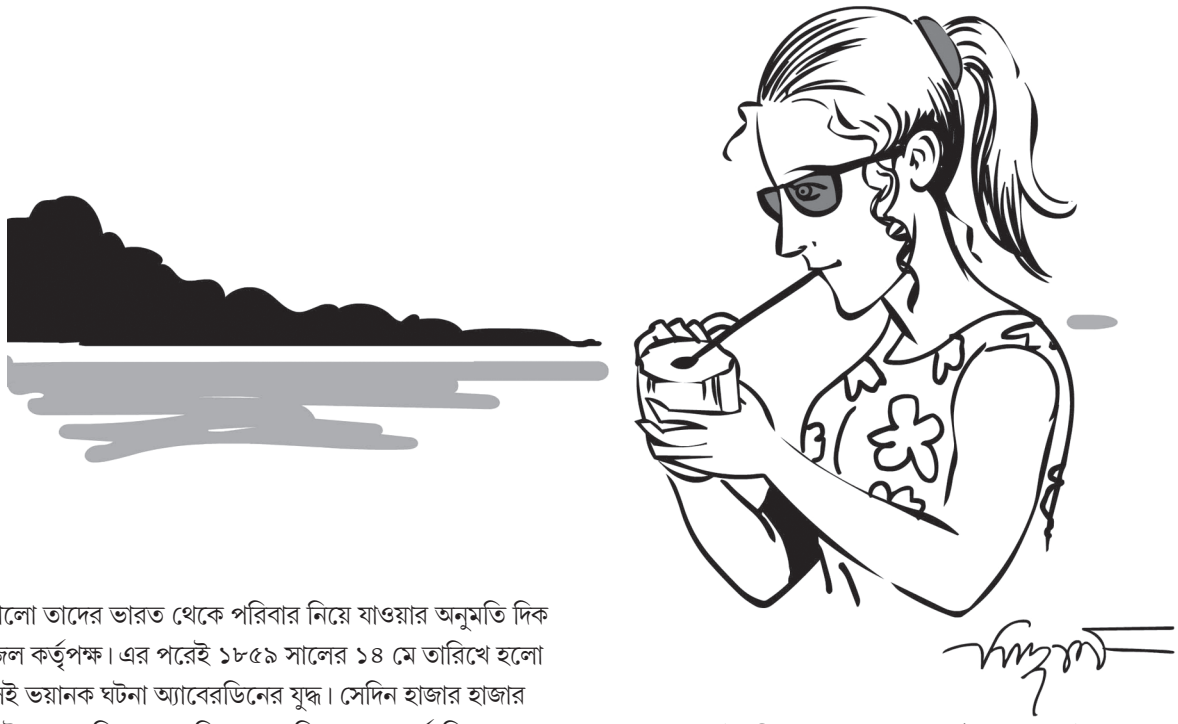

ভালো তাদের ভারত থেকে পরিবার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিক জেল কর্তৃপক্ষ। এর পরেই ১৮৫৯ সালের ১৪ মে তারিখে হলো সেই ভয়ানক ঘটনা অ্যাবেরডিনের যুদ্ধ। সেদিন হাজার হাজার গ্রেট আন্দামানিজ জনজাতির মানুষ তির-ধনুক, বর্শা নিয়ে আক্রমণ করে ইংরেজ স্কন্ধাবার। ইংরেজের বন্দুক সহজেই প্রায় আড়াই হাজার জনজাতিকে মেরে অ্যাবেরডিনের যুদ্ধ জিতে যায়। ডাক্তার জেমস ওয়াকার অবশ্য আর বেশিদিন আন্দামানে থাকেননি। তার জায়গায় এলেন কর্নেল জে সি হাউথন।

কিন্তু এর মধ্যে অনেকটা না বলা কথা আছে। অনেক সম্মান, প্রেম আর বিশ্বাসঘাতকরা কথা। যার কিছুটা অংশ প্রকাশিত হয় লন্ডন চেম্বারস্ জার্নালের পপুলার লিটারেচার (সাইন্স অ্যান্ড আর্টস)-এর মার্চ ২৪, ১৮৬০ সংখ্যায় শিরোনাম 'অ্যাডপর্টেড ইন আন্দামান।'

ষষ্ঠ দৃশ্য

মহা বিদ্রোহের পরে কলকাতা, মাদ্রাজ, করাচি, সিঙ্গাপুর আর বার্মা থেকে কাতারে কাতারে বন্দি আসতে থাকে। প্রথমে তাদের চাথাম দ্বীপ পরিষ্কার করতে পাঠানো হয়। ড. ওয়াকার রস দ্বীপে হেডকোয়ার্টার্স বানানোর প্রস্তাব দিলেন। ১৮৫৮ সালের ৭ মে রস দ্বীপের অনুমোদন মিলল। ৬ নভেম্বর সেখানে এক হাজার কয়েদি থাকার মতো ব্যবস্থা তৈরি হলো। রস, চাথাম, ভাইপার আর পোর্ট ব্লেয়ার চার জায়গাতেই সংশোধনাগার তৈরি হলো। ড. ওয়াকার আরও ১০,০০০ কয়েদি পাঠাতে বললেন। কারণ, সকাল সন্ধ্যা লোক মারা যাচ্ছিল। তার ডায়েরির পাতায়, 'ব্যাটারা পালাবার জন্য উৎগ্রীব। আমি ওদের মার্কো পোলোর বই থেকে পড়ে শোনালাম, এখানে ২০০টিরও বেশি দ্বীপে আদিম মানুষে ভরা। তারা তাদের উপজাতির না হলেও ধরে মেরে দেয়, তারপর কেটে খেয়ে ফেলে।'

শুরুতে আটজন ইংরেজ অফিসার, একজন ভারতীয় ওভারসিয়ার, দুজন দেশীয় ডাক্তার আর পঞ্চাশজন দেশীয় রক্ষী নিয়ে ড. ওয়াকার দ্বীপে পৌঁছালেন। সঙ্গে ৭৭৩ জন ভয়ানক আসামি। এই ৭৭৩ জনের সর্বশেষ হিসাব এরকম হয়েছিল, টোটাল রিসিভ্ড ৭৭৩, হাসপাতালে মৃত্যু ৬৪ জন, পালিয়ে যাওয়ার পরে আর পাওয়া যায়নি ১৪০ জন, আত্মহত্যা করে ১ জন, পালিয়েছিল তারপর খুঁজে পেয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ৮৭ জনকে। শেষ পর্যন্ত হাতে ছিল ৪৮ জন।

১ এপ্রিল ১৮৫৯, একদল বন্দি বন্দুক, ছুরি আর কুঠার নিয়ে হামলা করে। একজন রক্ষীকে নিকেশ করে, সুপারিটেনডেন্ট ড. ওয়াকার কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচেন।

সেই সঙ্গে চলত বুনোদের আক্রমণ। ওই এপ্রিল মাসেরই ৬ তারিখে ২৪৮ জন কয়েদি যখন চাথামের উপকূলে কাজ করছিল, তখন প্রায় ২০০ জনের মতো বুনোদের একটা দল আক্রমণ করল। তিরের আঘাতে মারা গেল তিনজন কয়েদি।

১৪ এপ্রিল ১৮৫৯ পরবর্তী আঘাত প্রায় দেড় হাজার আদিম জনজাতির লোক তির-ধনুক, কুঠার, ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুটো ভাগে প্রায় ৪৪৬ জন কয়েদি ছিল। কয়েকজন রান্নাবান্না করছিল। সেদিন জনা চারেক মারা যায় আহত হয়েছল ৬-৭ জন।

১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসটা ড. ওয়াকারের জন্য দুঃস্বপ্নের ছিল। প্রায় ১০০ জন পাঞ্জাবি কয়েদি বিদ্রোহ করল। ড. ওয়াকারের ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। কী কারণে

সাজা না পাওয়া কয়েদিরা ওয়াকারের পক্ষ নিল। কোনোমতে বেঁচে গেলেন সুপার।

এপ্রিল মাসটা কাটার পরেই যে ঘটনা ঘটল তা আন্দামানের ইতিহাসে তো বটেই, সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে ইংরেজ বা অন্য ইউরোপীয় উপনিবেশ ছিল সকলের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ৬ মে ১৮৫৯, সকালবেলা এসে হাজির দুধনাথ তিওয়ারি। গায়ে একটা সুতোও নেই। নিম্নাঙ্গ ঢেকে রেখেছে গাছের বাকল দিয়ে। কোনোমতে ওয়াকারের অফিসের সামনে এসে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ একজন জল নিয়ে এল ড. ওয়াকারের ইশারায়। পাক্কা একবছর ২৪ দিন কেটে গেছে। দুধনাথ পালিয়েছিল জেল থেকে। দুধনাথ একটু ধাতস্থ হয়ে যা বলল সেটা আরও মারাত্মক। ঠিক ১০ দিন পরে সারা আন্দামানের একটি জনজাতি একসঙ্গে আক্রমণ করবে পোর্ট ব্লেয়ার। ১৭ মে ঠিক মাঝরাতে হাজার হাজার গ্রেট আন্দামানিজ আক্রমণ করবে পোর্ট ব্লেয়ার।

'কিন্তু তুমি বাপু এত খবর জানলে কীভাবে?'

ডাক্তার ওয়াকারের চোখেমুখে সন্দেহ। 'আমি জানি, আমি সত্যি বলছি।' এক লহমায় নিজেকে উজাড় করতে চায় দুধনাথ, 'আমি ছিলাম তো ওদের সঙ্গে, ওরা আসছে। সব দ্বীপে দ্বীপে ওরা খবর পাঠিয়েছে। অনেক অনেক বুনো একসঙ্গে আসছে। তোমাদের রাতের অন্ধকারে শেষ করে দেবে। আমি সত্যি বলছি সাহেব, সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর।'

চায়ের কেটলি পেয়ালা পিরিচ এসে গেছে টেবিলে। ড. ওয়াকার চায়ের পেয়ালায় একটা লম্বা চুমুক দিলেন। সেনাবাহিনীতে থাকার সময় থেকেই চা তার খুব প্রিয়। আরাম কেদারায় দু-তিনবার দোল খেয়ে বললেন, 'বেশ তো, ভালো কথা। কিন্তু তারিখ, সময়, কোথায় আক্রমণ করবে সব ঠিকঠাক বুঝলে কী করে? তুমি কী ওদের ভাষা জানো?'

'হ্যাঁ, আমি ওদের পুরো ভাষা জানি। সব কথা বুঝতে পারি। বলতে পারি। আমি তো বিয়ে করেছি ওদের মেয়েকে।'

'বিয়ে? ম্যারেজ? আই মিন ইউ...'।

দুধনাথ ভাবলেশহীন ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, এই এগারো মাসের মতো হলো। মাগির পেট হয়েছে, বাচ্চা হবে।'

ড. ওয়াকার লোহার মতো মানুষ। এই জঙ্গলে সাপখোপ, বিদ্রোহী, জঙ্গলি নিয়ে আরও কঠিন, কঠোর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তার চোখটাও কুচকে এলো, 'মানে? তাহলে তুই আমাদের সাহায্য করতে এলি কেন? আমি তো কিছুই...'।

দুধনাথ সাপের মতো বুকে হেঁটে ওয়াকারের প্যাডক কাঠের আরামকেদারার একেবারে কাছে এগিয়ে গেল। জড়িয়ে ধরল আরাম কেদারার একটা পা। তারপর ভরসা করে শ্বাস নিয়ে বলল, 'আমরা তো মানুষ, সভ্য মানুষ। আর আপনারা আমাদের আরও সভ্য করার জন্য এদেশে এসেছেন। আমি সভ্যদের সঙ্গে থাকব, এটাই চিন্তা করলাম।'

ওয়াকার প্যাডক কাঠের আরাম কেদারায় দুলছেন, চা পান করছেন। আর শুনছেন।

'আমি আর পারছিলাম না সাহেব। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি সভ্য মানুষের সঙ্গে থাকব। সারা জীবন জেলে থাকব। কালাপানির এপারেই মরব। কিন্তু তোমাদের মতো সভ্য জাতির প্রতি যে বেইমানি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তাই ফিরে এলাম সাহেব। তৈরি হতে হবে। ওইদিন ঠিক মাঝরাতে ওরা আসবে। তৈরি হতে হবে সাহেব।'

ওয়াকার উঠে দাঁড়ালেন। বজ্র নির্ঘোষে হুংকার দিলেন, 'আবদুল্লা! আবদুল্লা! সবকো গ্রাউন্ড মে বুলাও।'

দুধনাথের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। ১৭ তারিখ মাঝরাতে আক্রান্ত হলো অ্যাবেডিন ঘাঁটি। হাজার হাজার গ্রেট আন্দামানিজ ঝাঁপিয়ে পড়ল। তির-ধনুক, বল্লম, কুঠার হাতে। কিন্তু ইংরেজ প্রস্তুত ছিল। বন্দুকের গুলিতে মরতে লাগল শত শত স্থানীয় জনজাতির মানুষ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দেশী নৌকোও এনেছিল ওরা। মৃত্যুর সংখ্যা যখন হাজার ছাড়িয়ে গেল, তখন ওরা হাল ছেড়ে দিল। ছুটে, নৌকো, ডুঙ্গিতে করে পালাতে লাগল বাকি বেঁচে থাকা লোকেরা। ইংরেজ জিতে গেল অ্যাবেডিনের যুদ্ধ, মধ্যরাত, ১৭মে ১৮৫৯।

সভ্য ইংরেজ দুধনাথ তেওয়ারির কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিল। মুক্ত করা হলো দুধনাথকে। দুধনাথ বাড়ি ফিরে এলো। ইংরেজ কোম্পানির দেওয়া টাকা পয়সায় ভালো ঘরদোর বানাল। তারপর স্বজাতিতে বিয়ে করল। তারা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে লাগল।

সপ্তম দৃশ্য

প্রায় জানোয়ারের মতোই জীবন কাটছিল সকলের। সকাল থেকে উঠেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম। জঙ্গল কাটা, মাটিতে গর্ত করা, মাল তোলা সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর কী ভীষণ জঙ্গল। পোকামাকড় সাপ কী নেই! কয়েকদিন পরপর জঙ্গলিরা ধেয়ে আসে তির-ধনুক নিয়ে। খাওয়াও প্রায় পশুর মতোই। কখনো কোনোমতে সেদ্ধ করা, কখনো বা কাঁচাই।

জাতপাত রক্ষার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখান থেকে বের হতেই হবে। সেটা প্রতিদিন সকালেই মনে হয়। কত তারিখ, কী বার আর মনে থাকে না। এখন তো কোন মাসও ভুলে যায় মাঝেমধ্যে। আর আন্দামানের আবহাওয়াতেও গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত কী নেই। এমনকী শীতও নেই। প্রতিদিনই কেউ না কেউ রোদে কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

তারপর তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে। পরদিন শুনছে মরে গেছে লোকটা।

নেহাত কপালের গেরো, তাই দুধনাথ এই নরকে এসেছে। এইসব বিদ্রোহ দেশ, আজাদি কোনোকালেই দুধনাথকে টানতো না। ইনফ্রান্টিতে কাজ করতে গিয়েছিল দুটো পয়সার মুখ দেখবে বলে। কানপুর ক্যান্টনমেন্ট যখন জ্বলছে, দুধনাথ তেওয়ারির কোনো তাপ উত্তাপ ছিল না। কিন্তু লোভে পাপ! একদিন সন্ধ্যায় সাত আটজন সিপাহি আর একজন সুবেদার এলো। দুধনাথের হাতে ধরিয়ে দিল একমুঠো কয়েন। একদম চকচকে রানির ছবিওয়ালা। দুধনাথের চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। মালখানার চাবি সাহেব কোথায় রাখে সেটা পরম বিশ্বাসী দুধনাথই জানত। বন্দুক বেরও হলো, কিন্তু পরদিন সকালেই কানপুরের রেজিমেন্ট থেকে একশো সৈন্য এসে বিদ্রোহীদের নিকেশ করে দিল। কার্যকারণ যোগে জালে পড়ে গেল দুধনাথ। কালাপানি পার হতে হলো। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কত জন্ম ধরে করতে হবে কে জানে?

কয়েকদিন ধরেই পরিকল্পনা চলছিল। পালাতে হবে। পালাতেই হবে। আবদুল্লা কানপুর ক্যান্টনমেন্টে রান্নার কাজ করত। পৃথিবীর যে কোনো বিষয়েই আবদুল্লার অগাধ জ্ঞান। আবদুল্লার খালতো ভাই জাহাজে কাজ করত। তার কাছ থেকেই শুনেছিল, আন্দামানের এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দশ বারো মাইল যেতে পারলেই বার্মা। আর বার্মা মুলুকে ইংরেজের রাজত্ব নেই। একবার পৌঁছাতে পারলেই কেল্লা ফতে।

ভোরবেলাতেই বের হয়ে পড়েছিল ওরা। একজন প্রহরীর মাথায় আলতো চেলা কাঠের বাড়ি। খোলা হলো লোহার দরজা। পিলপিল করে বের হয়ে এলো ওরা। মোট একশো চল্লিশ জন।

মুক্তি! মুক্তির কী আনন্দ! বন্দিদশা থেকে বের হয়ে একবার ভালো করে খোলা আকাশের দিকে তাকালো দুধনাথ। একবার ইচ্ছে হলো ঘাসের উপর শুয়ে আকাশটা দেখে চোখ ভরে নিতে। কিন্তু সেই সময় কোথায় পালাতে হবে। দক্ষিণ দিকে ছোটে। মাত্র দশবারো মাইল! ব্যাস!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এত বড় দলের পাঁছ-ছয় জন নেতা হয়ে গেল। দক্ষিণ দিকটা ঠিক কোন দিকে এটা একটা বড় সমস্যা। প্রথমে মনে হলো সমুদ্র তীর ধরে গেলেই দক্ষিণ হবে না। কিন্তু দুপুর যখন গড়িয়ে এলো তখন বোঝা গেল ধারণাটা ভুল। বেলাভূমি নিজের খেয়ালে গেছে একেঁবেঁকে। দুপুরের জন্য কিছু খাবার ওরা এনেছিল। সেটা ভাগ করার সময় প্রায় মারামারির উপক্রম। যাই হোক খুব বেশি সময়ের বিষয় নয়। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিষয়। তারপরেই বার্মা।

কিন্তু সন্ধ্যার আগেও বার্মা সীমান্ত এলো না। সবার মনেই হতাশা। আবদুল্লা তখনও বলছে, বারো মাইল এখনও শেষ হয়নি। এদিকে খাবারও ওরা বিশেষ আনেনি। বিকেলে যখন চনমনে খিদে তখন ব্যারাকপুর রেজিমেন্টের তিন-চারজন কী একটা পেয়ারার মতো ফল খেয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই ওরা বমি করতে শুরু করে। ওদের অসুস্থতার জন্যও পুরো দলের যাত্রার গতি কমে গেল। দুজনে মিলে এক একজনকে কাঁধে নিয়ে এগোতে লাগল।

সন্ধ্যায় ওরা সমুদ্রের তীরে একটা জায়গায় রাত কাটাবে ঠিক করল। প্রথমদিকে ওরা ভেবেছিল ওয়াকার হয়তো ওদের খোঁজে লোক পাঠাবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত পেছনে কোনো বন্দুকের আওয়াজও শোনেনি ওরা।

কিন্তু কেন লোক পাঠালো না ওয়াকার? এর আগে যারা পালিয়েছিল কয়েকজনকে ধরে এনে ফাঁসিতেও ঝুলিয়েছিল শয়তানটা। আজ হয়তো এতজন একসঙ্গে পালিয়েছে বলে হাল ছেড়ে দিল। নাকি ওর মাথায় অন্য কিছু কাজ করছে? যাগ্গে যাক। জীবনে আর কখনো আর ওর সঙ্গে দেখাই তো হবে না।

সমুদ্রের তীরে যে জায়গায় ওরা রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করল, সেখানে বিশাল উঁচু উঁচু সি-মহুয়ার গাছ। সেই মহীরুহের তলায় ঝরা পাতার উপরে শুয়ে পড়ল সবাই। রাতে বৃহৎ বনস্পতির মাথার ঝাকড়া পাতার মধ্যে থেকে দূরে কালো আকাশের মধ্যেকার একটি দুটি তারা। সারাদিনের ক্লান্তি, মুক্তির আনন্দ, আগামী ভবিষ্যতের অজানা হাতছানি— এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেল। সাপখোপ বিছেটিছের কথা একবার মনে এসেছিল বটে, তবে ঘুমের নেশায় আর সেই ভয় খুব বেশিক্ষণ মাথায় থাকার সুযোগ পেল না।

দুধনাথের ঘুম ভাঙল প্রবল চিৎকারে। ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটছিল। ঘুমের চটকা কাটতেই বোঝা গেল কী সর্বনাশ হয়ে গেছে। জঙ্গলিদের একটা বিরাট দল তির-ধনুক নিয়ে আক্রমণ করেছে দুধনাথদের। সকলেই ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত মানুষগুলোকে নির্বিচারে তির মারছে আক্রমণকারীরা। কে যেন দুধনাথের কাধে থাপ্পড় মেরে বলল, 'ভাগ! জলদি ভাগ যা।'

দৌড় দৌড়। জঙ্গলের গাছ, কাঁটায় পা ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু থামলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। যে দলটা দুধনাথের সঙ্গে একই দিকে পালিয়েছিল তাতে মোট বত্রিশজন ছিল। অনেকক্ষণ পরে একটা জলাশয়ের পাশে ওরা থামল। একেবারে মুখ ডুবিয়ে জল খেল সকলে। কী শান্তি! ওরা মরেনি। বাঁচার কী ভীষণ আনন্দ! কিন্তু ওদের দুজনের তির লেগেছে। গভীরভাবে ক্ষত হয়ে গেছে ওদের। একজনের পায়ের থাইতে আর একজনের ঘাড়ের কাছে। ওরা প্রায় চলতেই পারছে না। অন্যরাও ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। কিন্তু কোথায় খাদ্য? জলের সন্ধানে দলটা সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে। তাই কচ্ছপ বা অন্য সহজ খাবারের সন্ধান নেই। ওরা গোল হয়ে বসেছিল। সকলের মাথায় চিন্তা, এরপর কী হবে? ফিরে গেলে খাবার পাবে? কিন্তু দু-দিনের জন্য। তারপর ফাঁসিতে লটকে দেবে। এখনও যারা কেবল ফলমূল খাচ্ছে তাদের জন্য বিশেষ কিছু নেই। চেনা পরিচিত ফল এই জঙ্গলে প্রায় নেই

বললেই চলে। হঠাৎ পাশের জঙ্গলটা একটু নড়েচড়ে উঠতেই সকলে ভয়ে ছিটকে গেল। কিন্তু তখনই আসল ঘটনা বুঝে চার-পাঁচজন ঝোপটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা বড়সড় বন্য বরাহ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খালি হাতে কাবু করে ফেলল একটা বড় দাঁতাল বন্য বরাহকে।

বিকেলের দিকেই সাপ কামড়াল দুধনাথের একই ক্যান্টনমেন্টের রবিপ্রসাদকে। রবি গাছের তলায় পড়ে থাকা নারকোল কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিল। পাকা কেউটের কামড়ে একটা মানুষ কীভাবে মারা যায়, চোখের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখল সবাই। রবির চোখের আলো প্রথমে ঝাপসা হয়ে এল। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা আর তার সঙ্গে আপ্রাণ বাঁচার জন্য চিৎকার। দিনের আলো নিভে এলো।

রাত্রে ওরা ঠিক করল যে সারারাত পালা করে পাহারা দেবে। জঙ্গলিরা এলে যেন সবাইকে আগে থেকে সতর্ক করতে পারে। মাঝরাত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে যখন শুতে এলো দুধনাথ তখন রবির নিথর শরীরের দিকে একবার অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল। যাদের তির বিঁধেছিল, তারা এখনও গোঁগাচ্ছে। তবে গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ভোররাতে কারও ডাকে ঘুম ভেঙে গেল দুধনাথের। সবাই পালাচ্ছে। দুধনাথও উঠে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। কে যেন বলল, 'যে তিনজন পড়ে রইল? চৌধুরী এখনও বেঁচে আছে...'

কালু ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'তুই থেকে যা। আমরা পরে এসে তোদের নিয়ে যাব।'

শুরু হলো আবার যাত্রা। অজানা পথে যাত্রা। ক্লান্ত শরীর, সারা শরীরে কাটা ছেঁড়া তবু বসলেই মৃত্যু। কিন্তু খুব বেশিদূর ওরা যেতে পারল না। একটু এগোতেই একেবারে সামনে এসে গেল জনা পঞ্চাশেক জঙ্গলি। আবার আক্রমণ। আবার মৃত্যু চিৎকার।

এবার কী মনে হতে দুধনাথ মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর সাপের মতো বুকে হেঁটে সরে এলো অনেকটা দূরে। তারপর নিচু হয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে আসতে গিয়ে পড়ল একটা খাদের মধ্যে। খাদের মধ্যে নিজেকে একদম সেঁধিয়ে দিয়ে দেখতে থাকে দুধনাথ। নির্দয়ভাবে এক এক কুরে খুন করল তার সঙ্গীদের। তারপর জঙ্গলিরা তন্নতন্ন করে খুঁজল চারদিক। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল দুধনাথ। একটু শব্দ, একবার সন্দেহ হলে আর নিস্তার নেই।

অনেকক্ষণ দেখে একদম নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল দলটা। তারপরেও মাথা তুলতে ভয় করছিল দুধনাথের। হঠাৎ খাদের মধ্যেই কে যেন তার পেটের কাছে খোঁচা মেরে বলল, 'উঠ, অব চলে গয়ে।'

দুধনাথ আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠে বলল— 'কৌন?'

লোকটা দুধনাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ চেপে ধরল, 'চোপ, চিল্লাও মত।'

দুধনাথ এবার দেখল একজন নয়, দু-দুজন কয়েদি। অখিলেশ আর ভোগেন্দ্র। ওরাও একই সঙ্গে জেল থেকে পালিয়েছিল।

এবার তিনজনের পথ চলা। এই ক'দিনে জঙ্গলে বাঁচার বেশ কিছু কায়দা রক্ত করে নিয়েছে দুধনাথরা। খাওয়ারও বেশ কিছু জিনিস চিনে গেছে তারা। বোধহয় দিন তিনেক ওরা একসঙ্গে ছিল। ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে বার্মাতে পৌঁছানোর স্বপ্ন। কোনো দিকেই কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

সেই দিনটাও শুরু হয়েছিল ভালোভাবেই। সকালবেলা ওরা পেট ভরে খেয়েছিল কুলের মতো খুব মিষ্টি ফল। পাশে একটা মিষ্টি জলের ঝরনা। পেট ভরে জল পান করল তিনজনে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল। এমন সময়ই সেই অঘটন ঘটল।

হঠাৎ দেখল একটা বড় জঙ্গলিদের দল এদিকে এগিয়ে আসছে। তিনজন পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করার আগেই একেবারে পঙ্গপালের মতো ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একেবারে বুকে তির এসে বিঁধল ভোগেন্দ্রর। অখিলেশ বর্শার আঘাতে আর্তনাদ করে উঠল। দুধনাথ দেখছে একটা বড় দল তার দিকে ধেয়ে আসছে। তাতে ছেলে মেয়ে সবাই আছে। তির ছুটে এলো দুধনাথের দিকেও, পাঁজরের হাড় ছুঁয়ে গেল। লুটিয়ে পড়ল দুধনাথ। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তির বিঁধল পায়ে। দুধনাথের শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু ও ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

আগেও লক্ষ্য করেছিল যে বুনোরা তির নষ্ট করে না। তির মারার পরে মৃত শিকারের গা থেকে তির খুলে আবার পিঠের তূণে রেখে দেয়। দুধনাথের কাছে এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

দুধনাথের পায়ের তির টেনে খোলার সময় লোকটা বুঝতে পারল ও বেঁচে আছে। বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই ও আবার তির তাক করল দুধনাথের দিকে।

আকুল দুধনাথ মরিয়া হয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠল, 'নেহী! মত মারিয়ে।' দুটো হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করতে থাকে। কিন্তু সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু। ধনুকের ছিলে ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে এগিয়ে আসবে মৃত্যু।

হঠাৎ এক নারী কণ্ঠ ঝংকার দিয়ে উঠল, 'বোনীল, বোনীল' (শান্ত হও, শান্ত হও।)।

মেয়েটা ছুটে এসে ঘাতক পুরুষের হাত চেপে ধরল।

অষ্টম দৃশ্য

আজ সকালে উঠেই, লিপার মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল। ঝরনার জলে মুখ ধুয়ে উপরে তাকিয়েই দেখে দেবী দাঁড়িয়ে। একদম পেটের কাছে এত্তোবড় একটা ডিমের থলি নিয়ে যেন আট হাত দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। ওর চেনা বুলবুলটা তখনই ওর গালের কাছ থেকে উড়ে গেল। যেন বলে গেল, 'কী গো, খুব আনন্দ দেখছি!'

লিপা প্রায় নাচতে নাচতে ঘরে ফিরে এলো। মা সকালে ওর জন্য একটু সিনি রেখেছিল। ও সিনি খেতে খুব ভালোবাসে না, তবু মা বললে খেতেই হয়।

বাটি শেষ হতে না হতেই বাইরে হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। আজ ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে টেরো শিকারে যাওয়ার কথা। লিপার বর্শার হাত খুব ভালো। বিশ হাত দূরে ছুটন্ত কোনো শুয়োরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে লিপা।

লিপা এক চুমুক জল পান করেই বাইরে ছুটে বের হলো। কুড়ি-বাইশ জনের দল চলল সমুদ্রের দিকে।

দ্বীপে জীবন কত শান্তির ছিল। দক্ষিণের অসভ্য জারোয়ারা মাঝেমধ্যে এদিকে এসে পড়ত ঠিক, তবে সেরোবুলের ভয়ংকর মানুষরা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না কখনোই। সেরোবুলে না আছে ভালো তির, আর বর্শাও নেই। শুধু টং-এর তৈরি অস্ত্রই ওরা ব্যবহার করে।

লিপার ঠাকুমা বলেন, তখন মকরশা দেবীও অনেক কাছে ছিলেন। ওদের খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু ওদের সময়ই যে কেন এমন বিপদ হলো? বাইরের থেকে কত দস্যু এলো। ওরা জঙ্গল কাটছে, এখানকার লোকেদের মারছে, আর ওদের কাছে আগুন বের করা তির আছে।

প্রতিদিন সকাল যেন নতুন করে ভয় নিয়ে আসে। আজ আবার কোন এলাকা দখল করে নিল দস্যুরা। এই সবক'টা আগন্তুককে না মারা পর্যন্ত লিপাদের শান্তি নেই।

টেরো, মানে কচ্ছপই ওদের প্রধান খাদ্য। এর সঙ্গে ফলমূলও খায়। শুয়রের মাংস, নোনা জলের মাছ, মিষ্টি জলের মাছ। বোল বলে মিষ্টি জলের মাছ সবারই খুব প্রিয়।

লিপাদের দলটা ছোটখাট পশুপাখি শিকার করতে করতে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। আজ দু-তিন দিনের মতো টেরো শিকার করে আনতে হবে। কিন্তু কিছু দূর এগোতেই দেখল, তিন তিনটে দস্যু শুয়ে আছে।

দেখা মাত্রই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। তিরে ঝাঁঝরা করে দিল তিনটেকে। কিন্তু বীরা একটার পা থেকে তির তোলার সময়ই দস্যুটা কেঁদে কঁকিয়ে উঠল। বীরা ওর চোখ লক্ষ্য করে তির মারছে, কিন্তু তখনই লিপার মনটা কেমন করে উঠল।

লিপা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল। লিপা এই দলের দলপতির মেয়ে। শিকারে দলপতি নেই, তাই লিপার কথাই শেষ কথা।

কিন্তু কী করা হবে দস্যুটাকে?

একটু ভেবে লিপা বলল, নিয়ে চলো সঙ্গে করে। টং মানে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হলো লোকটাকে।

সমাজে এই প্রথম কোনো জ্যান্ত দস্যুকে ঢোকানো হলো। মাকরশা দেবী দেখে পাতার আড়ালে লুকিয়ে গেলেন।

নবম দৃশ্য

লোকটা বাঁচবে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওকে এখানে নিয়ে আসার পরেও আর এক প্রস্থ অশান্তি হয়েছে। লিপার বাবা দলের সর্দার সবচেয়ে প্রথমে তার কাছে এসে নালিশ জানালো দলের ছেলেরা। কিন্তু লিপাকে সবাই চেনে। ওর জেদের কথাও জানে। তাছাড়া লিপার গুণে ওদের দলের তো বটেই অন্য দ্বীপের বো জনজাতিরাও মুগ্ধ।

লিপা বুড়ো ওলার কাছ থেকে গাছ গাছড়ার গুণের কথা শুনেছে। তারপর ও নিজের ক্ষমতায়, আর অধ্যবসায়ে একটু একটু করে আয়ত্ত করেছে ওই মহৌষধের বিজ্ঞান। আজ লিপার হাত মানে মাকরশা দেবীর আশীর্বাদ। দূর দূর দ্বীপ থেকেও অসুস্থ মানুষকে নিয়ে আসে। লিপা এক বছরে বাচ্চা থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধকে একইভাবে সেবা করে চিকিৎসা করে।

এই দস্যুটার শরীরের অনেক জায়গায় গভীর ক্ষত হয়ে গেছে। পাঁজরের কাছে তিরটা যে কারণেই হোক পিছলে গেছে ওটা সেরে যাবে। কিন্তু কোমরের নীচে যে ক্ষতটা হয়েছে সেটা অত্যন্ত গভীর। সেটা নিয়েই চিন্তা।

এই ধরনের ক্ষতের জন্য ওলা বুড়ো একটা গাছের শিকড়ের কথা বলেছিল। কিন্তু সেটা পাওয়া যায় বোয়া দ্বীপে। ওখানে সমুদ্রের ধারে অনেক বেটাফো। সেই বেটাফো মানে ঝোপঝাড়ের মধ্যেই আছে এই মৃতসঞ্জীবনী গাছ। যে কোনো ক্ষত কয়েকদিনে শুকিয়ে দেয়।

আজ তাই সকাল থেকেই লিপা ঠুঙ্গি নিয়ে বের হয়েছে। যেতে হবে বোয়া দ্বীপে। অনেক সময় লাগবে।

সত্যি খুব ভাগ্য ভালো লিপার। সারাদিনের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। যে গাছের শিকড় খুঁজতে গিয়েছিল, পাওয়া গেছে সেটা। সেই সঙ্গে আরও কিছু গাছের লতাগুল্মও নিয়ে এসেছে ও। সারা দিনের পরিশ্রমের শেষে যখন ও ফিরে এলো, তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা।

দস্যুটাকে যে বিছানায় শোয়ানো ছিল সেখানে গিয়ে লিপা ডাক দিল। লোকটা কোনো সাড়াশব্দ করল না। বেশ জোরে জোরে চিৎকার করে ডাকল লিপা। কোনো উত্তর নেই।

লিপার শিরদাড়া দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। তবে কী? ও এবার একটু একটু করে এগিয়ে এলো, কপালে হাত দিয়ে দেখল, বেঁচে আছে। কিন্তু গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

সেই রাতটা লিপার জীবনে একটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ও প্রথমে মাথায় জল দিয়ে অনেকক্ষণ ধুইয়ে দিল। তারপর সেই মহৌষধি বেটে অতি যত্নে প্রলেপ দিয়ে দিল।

রাতের প্রহরে প্রহরে ওষুধ তৈরি করে মুখ হাঁ করিয়ে খাওয়াতে থাকে লোকটাকে। ধীরে ধীরে জ্বর কমে গেল। বাইরে চাঁদ উঠেছে। সন্ধ্যায় একপশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় ভিজে জঙ্গল, প্রকৃতি, বিশ্বচরাচর।

লোকটা হঠাৎ কী যেন বলে উঠল। 'পানি, পানি'। লিপা ওর কাছে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বুঝতে পারল ও জল চাইছে। কিন্তু এই ওষুধের পরে তো জল দেওয়া যাবে না।

তাহলে উপায়? অনেক ভেবে লিপা একটা লম্বা পাতার বোঁটা নিয়ে এলো। তারপর জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে বেশ কিছুটা পরে পরে মুখে দিতে থাকল। তৃষ্ণার্ত মানুষটা একটু পরে আর সহ্য করতে না পেরে, লিপার হাতটা ধরে ফেলল। লিপা লোকটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। খুব নরম স্বরে কিছু বলল। লোকটা কিছু বুঝল না।

লিপা এবার হাতের ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কী?'

দস্যু অস্ফুটে উত্তর দিল, 'দুধনাথ।'

বাইরে একটু একটু করে আলো ফুটছে। পাখিরা জানিয়ে দিয়ে গেল, সকাল হয়ে গেছে। লিপার চোখও জড়িয়ে এসেছিল বসে থেকে। পাখির ডাকে চোখ খুলল। লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বর নেই।

লিপা ধীরে ধীরে বাইরে বের হয়ে এলো। ধীর পায়ে এগিয়ে এলো সেই ঝরনাটার ধারে। এর পাশের প্রতিটা বড় গাছ, ছোট ঝোপ, কাঠবেড়ালি, বুলবুল পাখি— সবাই যেন ওকে কিছু বলতে চাইছে। ও পাথরের খাঁজ বেয়ে নীচে নেমে এলো। পায়ের নীচে কুলকুল করে বইছে জলের ধারা। লিপা নীচু হয়ে বসে, একহাতে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মাকরশা দেবীকে স্মরণ করে মনে মনে বলল, 'দুধনাথ যেন বেঁচে যায়।' তারপর হাতের জলটা খেয়ে নিল।

সকালে বাসি মুখে তিনবার কোনো মনের ইচ্ছা নিয়ে ঝরনার জল খেলে সেটা পূর্ণ হয়। লিপা তিন অঞ্জলি জল পান করে উপরে উঠে এলো।

একটা নীল পাখি ওর কাঁধে এসে বসল। আবার 'পিক' করে শব্দ করে উড়েও গেল।

এটা আবার কী পাখি! আগে তো কখনো দেখেনি লিপা!

দশম দৃশ্য

লিপার বিয়ের ঘটনায় বো সম্প্রদায়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। এই প্রথম কোনো বো মেয়ে একজন বিদেশিকে বিয়ে করল। দলপতি পুতিহার উপরও কম চাপ ছিল না। তবে দুধনাথ ছেলেটাও বেশ ভালো। বো উপজাতির লোকেরা কখনো এক জায়গায় থাকে না। ওরা এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে, এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। দুধনাথও একটু সুস্থ হওয়ার পর থেকে ঘুরে বেড়াতো লাগল লিপাদের দলের সঙ্গে। দুধনাথের পরনের জামা-কাপড় ছিঁড়ে পর্দাফাই হয়ে গিয়েছিল। একদিন দলের ছেলেরা জোর করে সেই ছেঁড়া জামা-কাপড় ওর গা থেকে খুলে নিল। সেদিন থেকে বো ছেলেদের সঙ্গে ওর বন্ধু দৃঢ় হয়ে গেল। দুধনাথও ওদের সঙ্গে একইভাবে ঘুরতে লাগল।

তবে দলপতি পুতিহার সম্ভবত দুধনাথের হাতে কোনো অস্ত্র দিতে বারণ করেছিল। তাই একদিন দুধনাথ ধনুক ধরে একটু নাড়াচাড়া করতেই দু'জন এসে ওর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল। পুতিহার হয়তো দস্যুদের বংশের কাউকে আশ্রয় দিলেও আসন্ন বিপদের কথা ভেবেছিল। তাই অস্ত্রে হাত দেওয়া মানা ছিল দুধনাথের।

লিপা যেদিন বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল, শুনেই পুতিহার রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিল। অসম্ভব, এটা কিছুতেই হতে পারে না। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে গেল। দু'জন বো ছেলে দুধনাথকে ধরে মারধর করাও শুরু করেছিল। কিন্তু এখন দুধনাথের বন্ধু হয়েছে তারা বেশ কিছু। তারা দুধনাথকে বাঁচিয়ে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল।

শেষপর্যন্ত ঠিক হলো বিয়ে হবে লিপার, দুধনাথের সঙ্গেই হবে। বো সমাজের প্রথামতো শুরু হলো তোড়জোড়। হাজার নিয়ম-কানুন।

ছেলে আর মেয়ে দু'জনকেই সাতদিনের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। যেতে হবে নির্জন জায়গায়। সামান্য ফল খেতে পারবে। কিন্তু বো সমাজের আসল খাবার টেরো মানে কচ্ছপ খেতে পারবে না এই সাতদিন।

বিয়ের অনুষ্ঠানে পুতিহার আর তার স্ত্রী খুব নাচল, তারপর খুব কাঁদল। মেয়েকে বিয়ের পরে দেখভাল করার জন্য নিমা নামে আর একটি মেয়েকেও সঙ্গে দিলেন বো সর্দার।

খাওয়ার ব্যবস্থাও হলো এলাহি। চারজন জোয়ান ছেলে মাথায় করে নিয়ে এলো ইয়া বড়ো বড়ো টেরো। উল্টে থাকা টেরোগুলো তাদের নৌকোর হালের মতো চারটে পা নাড়াচ্ছে ফটাস ফটাস করে। বো উপজাতির সকলে খেয়ে, নেচে, গেয়ে ঘরে চলে গেল।

সন্ধ্যার পরে নিমা ওদের বাসর সাজিয়ে দিল। দুধনাথ এখন সহজে কথা বলতে পারে লিপার সঙ্গে। বরং লিপাদের ভাষাতেই অত শব্দ নেই। তবে লিপার ছটফটে চলন আর তীক্ষ্ণ চোখের ভাষা অর্ধেক কথাই বলে দেয়।

লিপা বলেই ফেলল। ও খুব ভাগ্যবতী। ওর বর সভ্য সমাজের থেকে এসেছে। কত সুন্দর। কত আদব কায়দা জানে ওরা। লিপা সারা জীবন ধরে শিখবে ওদের জীবনচর্যা। লিপা দুধনাথের যোগ্য বউ হয়ে উঠবে। মাকরশা দেবীর নামে দিব্যি করে কথা দিল লিপা।

দুধনাথেরও কী মনে হলো সেদিন, সব কথা বলল। ওদের পরিবার, গ্রাম, বড় হওয়া। সবশেষে বলল, ভারতবর্ষের কথা। একটা দেশ। দেশ কী জিনিস সেটা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও লিপাকে বোঝানো গেল না। কিন্তু ইংরেজ বোঝানো গেল। ইংরেজের আক্রমণ শুনে লিপার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। তারপর সিপাহি বিদ্রোহ, ওদের কালাপানি সাজা, দুধনাথের কষ্ট, লিপার চোখ ছল ছল করে উঠল। গায়ে হাত রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস

ছাড়ল লিপা।

হঠাৎ নিমা মুখ ঢুকিয়ে বলল, 'তোমাদের কিছু লাগবে?'

অপ্রস্তুত দুধনাথ একটু ছিটকে গেল। লিপা কিন্তু শান্ত, ধীরভাবে বলল, 'না রে, কিছু লাগবে না। দরকার হলে তোকে ডাকব।'

নিমা খিলখিল করে হেসে চলে গেল।

একাদশ দৃশ্য

সমুদ্রের ধারে একা বসে আছে দুধনাথ। এই জঙ্গলের জীবন এখন তার অসহ্য লাগছে। সামনে বেশ কিছুটা অংশে সমুদ্র স্থলভাগের ভেতরে ঢুকে এসেছে। সেখানে ভর্তি হয়ে আছে কাঁকড়া গাছের জঙ্গল। সেই ম্যানগ্রোভের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়ছে দুধনাথ। সত্যি আর ভালো লাগছে না।

লিপার গর্ভে সন্তান আসছে শুনে লিপা আনন্দে হেসে, নেচে, কেঁদে একশা। সেদিন থেকেই কেন যেন দুধনাথের ভীষণভাবে অপছন্দ হতে থাকে লিপাকে। গ্রামে কারও সন্তান হবে, কেউ বাবা হবে খবর পেলে লোকেরা কত আনন্দ পায়। মিঠাই খাওয়ায়। মিঠাই? ভাবতেই হাসি পেল দুধনাথের। এখানে তো সব কিছুতেই টেরো। কচ্ছপ। কত রকমের কচ্ছপ। বমি এসে যায়। নিজে বাবা হবে শুনে যেন বিরক্ত লাগছে দুধনাথের।

দুধনাথ যত লিপাকে উপেক্ষা করতে থাকে, বউ যেন তত বেশি করে ওকে ভালোবাসতে থাকে। ওর খাওয়া, সবরকম সুবিধা, যেন কোনো ত্রুটি না হয়। আর প্রতি মুহূর্তে আপশোস করে, সভ্য সমাজের মতো হয়ে উঠতে পারল না লিপা। কিন্তু লিপা নিশ্চয়ই একদিন ওর যোগ্য বউ হয়ে উঠবে। ঠিক হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা অশান্তি হয়েছে। নিমা ওই দম্পতির সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। মনপ্রাণ দিয়ে ওদের সেবা করত। কিন্তু লিপা পোয়াতি হওয়ার পরে নিমার সঙ্গে দুধনাথের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। নিমা ঠিক চাইছিল না এইসব। কিন্তু দুধনাথ-লিপাকে ও দেবতাদের মতোই ভক্তি করে। তাই ধীরে ধীরে দুধনাথ মানিয়ে নেয় নিমাকে। ওদের সম্পর্কটাও অনেকটা এগিয়ে যায়।

সেদিন লিপার শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। এইসময় বোল বলে একটা মিষ্টি জলের মাছের ঝোল খাওয়ায় বো উপজাতির মেয়েদের। কিন্তু বোল মাছটা রান্না করতে গিয়ে একটু নষ্ট করে ফেলেছিল নিমা। হয়তো সেই কারণেই শরীরটা খুব খারাপ লাগছে আজ বিকেল থেকেই।

'নিমা। নিই-ই মা-আ...' অনেকক্ষণ ধরে ডকেছে। উত্তর না পেয়ে ওই কষ্টের মধ্যেই ও উঠে এসে খুঁজতে থাকে নিমাকে। তখনই ওদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরে ফেলে লিপা।

সেই রাতটা কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। দুধনাথকে কিচ্ছুটি বলেনি। দুধনাথই অনেক পরে বোঝাতে এসেছিল, 'বিয়ের সময় তো, তোমার সঙ্গেই নিমাকে দিয়েছিল... তাই আমি ভেবেছিলাম...।'

আগুনে ঘিল পড়ল। লিপা একবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'দূর হয়ে যাও। চলে যাও আমার সামনে থেকে।'

দুধনাথ দাঁড়িয়ে আছে। লিপা এরপর চোখ মুছে কেটে কেটে বলল, 'এটাই বুঝি তোমাদের সমাজের নিয়ম? সবাইকেই মারো ফোং মনে করো। এটাই কি সভ্যতা? আমরা যা করি তাই বলি। সাহস করে বলি।'

আবার ডুকরে ওঠে লিপা। 'নিমাকে তো আমাদের সেবার জন্য দিয়েছিল। ও আমাকে কত ভালোবাসে, আমার বোন, আমার মেয়ে। ওর কতবড় ক্ষতি করে দিলাম আমি। আমার সঙ্গে কোনো বো ছেলের বিয়ে হলে আমি এত পাপ করতাম না। আমায় ক্ষমা করো। ক্ষমা করো দেবী। মাকরশা দেবী।'

তারপর থেকে দুধনাথের সঙ্গে লিপার সম্পর্ক খুব শীতল হয়ে গেছে। খুব প্রয়োজন হলেই লিপা কথা বলে।

অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল দুধনাথ। হঠাৎ খেয়াল করল একটা বড়সড় কালো মাকড়সা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একেবারে কাছে এসে গেছে। দুধনাথ প্রাণীটাকে মন দিয়ে দেখল। তারপর হাতের পাথরের টুকরোটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল। থেঁতলে গেল ছোট্ট প্রাণীটা।

দুধনাথ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। অনেক পুরনো রাগ, ক্ষোভ একসঙ্গে জমে থাকলে যেমন স্বর বের হয়, অস্ফুটে বলল, 'দেবী, ফুঃ!'

হঠাৎ লক্ষ্য করল সমুদ্রতীরে খুব গোলমাল হচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে দেখল বেশ কতগুলো ডুঙ্গিতে করে বো জনজাতির প্রচুর মানুষ ওদের দ্বীপে আসছে। সবাই উত্তেজিত। তির, ধনুক, বল্লম, বর্শা, সড়কি, লাঠি নিয়ে কেমন যেন যুদ্ধে যাওয়ার সাজে আসছে।

সেদিন বিকেলের মধ্যে প্রচুর উপজাতি মানুষ এসে জড়ো হল ওই দ্বীপে। দুধনাথ দেখল একটা বড় সভা আয়োজিত হচ্ছে। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল। দুধনাথ চোরের মতো চুপিচুপি গিয়ে দাঁড়ালো পিছনে।

এখন এক একটি দলের প্রধানরা বক্তব্য রাখছে। সকলের রাগ ওই সাদা চামড়ার দস্যুগুলোর ওপর। একজন তো বুঝিয়ে বলল, দ্বীপবাসীরা ভুল করে শত শত বাদামি মানুষদের মেরেছে। ওই বাদামি মানুষদের ওই সাদাগুলো বন্দি করে রেখেছে। এর প্রতিকার করতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে সাদাদের বিরুদ্ধে।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো, ওই সাদাদের মেরে

বাদামি বন্দিদের মুক্ত করা হবে। তারপর ওদের সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হবে যে ওরা দ্বীপে থাকবে না চলে যাবে। দ্বীপে থাকতে চাইলে থাকতে দেওয়া হবে। তবে উপজাতিদের বশত্য স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু ওরা সাদাদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কীভাবে! সাদাদের কাছে বন্দুক আছে। আগুন, গুলি এসবের সঙ্গে তির-ধনুক নিয়ে পারা যাবে না।

তবে উপায়? উপায় একটা আছে বটে। কিন্তু খুব সাবধানে, সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। মাঝরাত্রে আক্রমণ করা হবে রোজ আইল্যান্ডে। যেখানে সাদা চামড়ার দস্যুগুলো থাকে। যখন ওরা ঘুমিয়ে থাকবে তখনই নিকেশ করা হবে ওদের। জেগে উঠে বন্দুক দাগার আগেই সব খেল খতম।

ঠিক হলো একেবারে সোরাবুল মানে উত্তরের জারোয়াদের ভয়ংকর বনের থেকে একেবারে দক্ষিণ পর্যন্ত যত জায়গায় ওদের উপজাতির মানুষ আছে খবর দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে লাগোয়া দ্বীপগুলোতেও। সব্বাই এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। জয় নিশ্চিত!

দুধনাথ পেছন থেকে নিঃশব্দে সরে এলো। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পায়ের কাছে গর্জন মুখর সমুদ্র। উপরে তারা ভরা আকাশ। সমুদ্রের ওপারে দুধনাথের জেলা, তার গ্রাম, তাদের বাড়ি।

দুধনাথ তো আসলে সভ্য মানুষ। ইংরেজ আরও সভ্য। সভ্য সমাজের এতবড় ক্ষতির সময় তার কোনো ভূমিকা থাকবে না?

দিন দুয়েকের খাবার সঙ্গে নিল দুধনাথ।

মাথাটা ছোট থেকেই খুব খোলতাই দুধনাথের। এই কয়েক মাসে এই দ্বীপটা কয়েকবার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘোরা হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে অনেকগুলো কাছাকাছি দ্বীপেও।

ওর অনুমান মতো দিন দুয়েকের পথ। সভ্য সমাজের ত্রাণ করার ভার নিজের মাথায় নিয়ে তারা ভরা আকাশের নীচে বনের পথে এগিয়ে চলল সে।

অন্ধকার আকাশেরও একটা আলো থাকে। তারাই সেই আলোয় উত্তর দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে কয়েদি ওরফে দুধনাথ তেওয়ারি।

দ্বাদশ দৃশ্য

দরজায় দুবার ঠোকা দিয়ে অফিস ঘরের ভেতরে ঢুকে এল আন্দ্রেয়া। একটা জার্নালে চোখ বোলাচ্ছিল সুপ্রাজ। আন্দ্রেয়াকে দেখে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখল।

'হঠাৎ এই অসময়ে?' হেসে জিজ্ঞাসা করল।

আন্দ্রেয়া একটুও হাসল না। একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার আজ সন্ধ্যায় কোথাও যাওয়া আছে?'

'না। কেন?'

'আজ একজনের বাড়িতে চা খেতে যাব।'

'চা খেতে? কোথায়? কার বাড়িতে?'

'বোলা, গ্রেট আন্দামানিজ মেয়ে। পুলিশে চাকরি করে। আজ যেতে বলেছে।'

সুপ্রাজ আকাশ থেকে পড়ল। 'তুমি গ্রেট আন্দামানিজ মেয়ে পেলে কোথা থেকে? আর তোমাকে নেমতন্নও করল?'

আন্দ্রেয়া একটু রহস্যময় হাসি হাসল। তারপর একেবারে প্রাণ খুলে হেসে বলল, 'অর্চনা হর্ষে। পোর্ট ব্লেয়ার বিবেকানন্দ কেন্দ্র স্কুলের দিদিমণি। উনিই ব্যবস্থা করেছেন।'

সুপ্রাজ চোখ বড় বড় করে বলল, 'সত্যি ইংরেজদের ক্ষমতা আছে, মানতেই হবে।'

আন্দ্রেয়া একটু লজ্জা পেল, 'আরে না, না। বাসে আলাপ। অনেকদিন থেকেই। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্কুলে কয়েকজন গ্রেট আন্দামানিজ পড়ে। অর্চনাদির ফোন নম্বর ছিল। ওনাকে বললাম, ব্যাস, ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

তারপর একটু আদুরে স্বরে বলল, 'এক কাপ কফি হবে না স্যার? সরি ডাডা।'

কফি আসার পরে আন্দ্রেয়া মগটাকে নিয়ে একবার ঠোঁটে ছোঁয়াল। তারপর সিপ না নিয়েই আবার টেবিলে রাখল। 'জানো সুপ্রাজ, একটা জিনিস আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না।'

কফিতে গভীর চুমুক দিয়ে সুপ্রাজ বলল, 'কী সেটা?'

'দুধনাথ চলে যাবার পরে লিপা কী ভাবল? কী কী হতে পারে?'

সুপ্রাজ একটু সময় নিয়ে বলল, 'দেখ, আবেদিনের যুদ্ধে গ্রেট আন্দামানিজ, মূলত বো উপজাতির বেশিরভাগ অংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রায় শেষ হয়ে গেল আন্দামানের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী।'

'আর দুধনাথ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই তো সেই যুদ্ধ হয়েছিল। লিপা ভাবতেই পারে যে দুধনাথও যুদ্ধে গিয়েছিল। আর অন্যদের সঙ্গে সেও মারা গেছে।

আন্দ্রেয়া মুখে একটা চুক্ চুক্ শব্দ করল, কফির মগে একটা চুমুক দিল। আনমনে কিছু বলল। তারপর বেশ কিছুটা সময় নিয়ে বলল, 'না, আমার তা মনে হয় না। দুধনাথ চলে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে অ্যাবোডিনের যুদ্ধ হয়েছিল। এই এক সপ্তাহ লিপা অবশ্যই দুধনাথকে খুঁজেছে। খুঁজে খুঁজে কোনো হদিশ মেলেনি। অ্যাবোডিনের যুদ্ধে যেভাবে ইংরেজরা সতর্ক ছিল, তাতে যে কারও সন্দেহ হবেই যে কেউ আগে থেকে খবর দিয়ে দিয়েছিল। আর লিপার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে কার্যকারণ বোঝাটাও

খুব কঠিন কিছু হবে বলে তোমার মনে হয়?'

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে।

আন্দ্রেয়া নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'ভেবে দেখ, একটা মেয়ের মনে কী হবে। যাকে ভালোবেসে প্রাণ দান করল, যাকে বিয়ে করে নিজের সবটুকু দিল, যাকে সভ্য মানুষ বলে দেবতার আসনে বসিয়েছিল, সেই মানুষটা তার নিজের উপজাতির সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর আচরণ করল। ওর ভালোবাসার এই প্রতিদান পেল মেয়েটা!'

বো সমাজে সেদিন কী ভীষণ হাহাকার। কারও স্বামী মারা গেছে, কারও সন্তান, কারও ভাই, কারও বা স্বামী-সন্তান-ভাই সবাই মারা গেছে। আর এতকিছুর জন্য দায়ী যে তার সন্তানই নিজের গর্ভে ধারণ করে সকলের সামনে ঘুরছে লিপা। সেই লজ্জায়, ঘৃণায় তবে কী লিপা আত্মহত্যা করেছিল?

অফিসের সময় শেষ। সুপ্রাজ গাড়ি বের করল। আন্দ্রেয়া গাড়িতে বসে বলল, 'জঙ্গলিঘাটের দিকে যাব।'

গাড়ি এগিয়ে চলল জঙ্গলিঘাটের দিকে। আন্দ্রেয়া একটা বড় ঝিনুক হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখছিল। সেই ছোট্ট ঝিনুকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি বলতে কি জানো, লিপা যদি আত্মহত্যা করে থাকে, তবেই বেঁচে গিয়েছিল। কারণ এর পরে গ্রেট আন্দামানিজদের পুরুষের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে যায়। আর পুরুষহীন সমাজে মেয়েদের উপর আসে প্রচণ্ড অত্যাচার। ওই মেয়েদের এই জনহীন দ্বীপে যৌনদাসী হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে সিফিলিস আর হামে কাতারে কাতারে গ্রেট আন্দামানিজ মহিলার মৃত্যু ঘটে। সেই অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছিল হয়তো লিপা!

বিবেকানন্দ কেন্দ্র স্কুলটা একেবারে পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট গেটের উল্টোদিকে। সেখানকার দিদিমণি অর্চনা হর্ষেকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো।

মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেল, ওই গ্রেট আন্দামানিজ পরিবারে। অর্চনা দিদিমণি বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন এক ভদ্রমহিলা। দেখেই বোঝা গেল উনি আদিম জনজাতির নন। আন্দ্রেয়া যেন একটু হতাশই হলো। ও কিছু বলতে যাচ্ছিল, অর্চনা ওকে থামিয়ে বললেন, 'ও সুনেত্রা, বোনার বৌদি। সুনেত্রা ঝাড়খণ্ডের মেয়ে। এ বাড়ির বউ।'

'আর বোনা? ও নেই বাড়িতে?' আন্দ্রেয়ার গলায় উৎকণ্ঠা।

'আছে, আছে। সাজছে একটু। মেমসাহেব দেখতে আসবে শুনেছে।'

একটু পরে হলুদ সালোয়ার কামিজে এল আন্দমান পুলিশের কন্সটেবল বোনা।

একেবারে পেটানো চেহারা। ছোট করে কাটা চুল। কিন্তু সুপ্রাজ অবাক হয়ে দেখছিল একটা অদ্ভুত মিষ্টি আদুরে ভাব আছে। এসে বসল সোফায়, আন্দ্রেয়ার চোখে বিস্ময়। ওকেই প্রথমে বলল, 'নমস্তে।'

মেয়েটি অবশ্য ভীষণ লাজুক। দশটা কথায় একটা কথা বলে। তবে ওর কথার ঘাটতি পুসিয়ে দিচ্ছিল ওর বৌদি সুনেত্রা। সুনেত্রা দেখা গেল শ্বশুরবাড়ির এনপাইক্লোপিডিয়া। বোনা অ্যাবেদিন যুদ্ধের নামটুকুই খালি শুনেছে। সুনেত্রা প্রায় সবটাই জানে তবে লিপার কথা জানে না।

কথায় কথায় একটু দেরিই হয়ে গেল। সুনেত্রা বলল, 'রাতে খেয়ে যাও আমাদের বাড়িতে। আজ কচ্ছপের মাংস হয়েছে।'

আন্দ্রেয়া বলে উঠল, 'টেরো?'

এতক্ষণে বোনা যেন একটু সপ্রতিভ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ টেরো। আমি বানিয়েছি। আমি খুব ভালো রান্না করি।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

একেবারে নিকশ কালো প্রতিমার মতো আদলে মিষ্টি মুখটা। হাসতেই দুই গালে টোল পড়ল। সাদা ঝকঝকে দাঁত, কালো মুখমণ্ডলে এক বহু পুরাতন আবহ নিয়ে এলো। সুপ্রাজেরও মনে হল অষ্টাদশী লিপাই যেন হাসছে।

হঠাৎ আন্দ্রেয়া চেয়ার থেকে উঠে গেল বোনার কাছে। সোফায় বসা বোনাকে অবাক করে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর বোনার হাতদুটো ধরে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল ইংরেজ দুহিতা।

তারপর বেশ জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। ঘরের সকলে একটু অবাকই হলো। সুনেত্রা, অর্চনাদিদি আর সুপ্রাজ।

সুপ্রাজ কেবল বুঝতে পারছে। ড. ওয়াকারের হয়ে ক্ষমা চাইছে আন্দ্রেয়া। কিন্তু সুপ্রাজের কী করা উচিত। দুধনাথের পক্ষ থেকে একজন ভারতীয় হয়ে ওর কী ক্ষমা চাওয়া দরকার? পাঁচ প্রজন্ম পরে ক্ষমা করবেন কী লিপা? ▮

With Best
Compliments from :-

A
Well Wisher

বিভিন্নবাবা গল্পের সত্যজিৎ-কৃত চিত্ররূপ।

রসরাজ রাজশেখর

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌরাণিক যুগে ভারভূমিতে আবির্ভাব হয়েছিল পরশুরামের। প্রথমেই তাঁর নামের অনুষঙ্গ হিসেবে মনে পড়বে কুঠারের কথা। সেই প্রাচীনকালের ঘটনার পৃষ্ঠভূমি ও ইতিহাসে উল্লেখিত নরহত্যার কার্যকারণ ছিল ভিন্ন। একালের 'পরশুরাম' ছদ্মনামে খ্যাত রাজশেখর বসুর জন্ম হয়েছিল বর্ধমানের কাছে শক্তিগড়ে তাঁর মাতুলালয়ে ১৮৮০ সালে। তিনি উত্তরকালে পরশুরাম ছদ্মনামে তাঁর কলম সঙ্গী করে বাঙ্গালি মানসে চিরস্থায়ী হাসির ফল্গুধারা বইয়ে দেন।

পিতা চন্দ্রশেখর বসুর আরও তিন পুত্র ছিল। রাজশেখরের অগ্রজ শশীশেখর, অনুজ কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্র শেখর। কৃষ্ণনগরের কাছে উলাগ্রামের রাজশেখর শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী ও কার্যকারণ সম্পর্কে উৎসুক। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, 'মা যখন তার হাতে খেলনা দিতেন, টিনের ইঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাট্টু, একঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দেখতো ভেতরে কী আছে? কেন বাজে, কেন ঘোরে?'

এই শৈশব কৌতূহলই তাঁর ভবিষ্যতের কৃতী ছাত্র হওয়ার পথ সুগম করে দেয়। প্রথমে প্রেসিডেন্সি পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ণ শাস্ত্রে ১৯০০ সালে তিনি এমএসসি পরীক্ষায় প্রথম হন।

সেই অবিভক্ত বাঙ্গলায় স্নাতক হলেই মিলে যেত চাকরি। কৃতী ছাত্র আর এমএ। এমএসসি-দের তো কথাই নেই। কলেজে পড়ানোর কথা রাজশেখর কখনো মনেও আনেননি। তাঁর আবাল্য বিজ্ঞানমনস্কতা কোনো গভীর গবেষণামূলক কাজের দিকেই আকৃষ্ট থাকত। তাই তাঁর অধীত বিদ্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কোম্পানির নামের সঙ্গে যুক্ত তৎকালীন বাঙ্গালি ঐতিহ্যের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িক উদ্যোগ বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল-এর চাকরির হাতছানি তিনি এড়াতে পারেননি। এমএসসি পাশের পর আইনের পাঠ সম্পূর্ণ করে তিনি ১৯০৩ সালেই এখানকার কেমিস্ট পদে নিযুক্ত হন।

সকলেই জানেন, এই প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন কর্ণধার ছিলেন ভারতসেরা বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার্তিক বসু ও ড: রায়ের নেকনজরে পড়তে কর্তব্যনিষ্ঠ রাজশেখরের দেরি হয়নি। ভাবলে অবাক হতে হবে, তিনি এমনই অতুলনীয় কর্তব্যনিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন যে মাত্র তিন বছর যেতে না যেতেই কর্তৃপক্ষ ১৯০৬ সালে তাঁর হাতে সংস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব সঁপে দেন। সেই থেকে ১৯৩২ সালে অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে আসীন ছিলেন। অবসরের পরেও তাঁর পরামর্শ পেতে সংস্থা তাঁকে আমৃত্যু (১৯৬০) প্রধান উপদেষ্টার পদে আসীন রেখেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বেও রাজশেখর কর্তৃক পরিমার্জিত ও নবীকৃত (এখানেই তাঁর গবেষক মন সচেতন হয়ে উঠত) ফেনল, ন্যাপথলিন, কালমেঘ, ক্যাম্থারাইডিন মাথার তেল, বাঙ্গালির বদহজমের মহৌষধ জোয়ানের আরক আর স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙার পথে অগুরু সুগন্ধি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। রাজশেখরের যে দ্বৈত সত্তা তার প্রতি তিনি কখনও অমর্যাদা করেননি। তাঁর হাসির গল্পগুলি পড়লে তাঁর যে ছবি ভেসে ওঠে সেই লঘুতার সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিচালকের রূপের ছিল আমূল পার্থক্য। একেই পরিভাষায় বলে detachment বা বিযুক্তি। পরশুরাম তাঁর তুমুল হাস্যরসাক্রান্ত লেখাগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও নিজেকে রেখেছিলেন আশ্চর্য রকম বিযুক্ত। সেক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র আর ব্যক্তি জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা তো ছিল তাঁর পক্ষে প্রকৃতি ধর্ম। প্রমথনাথ বিশীর লেখায় পাওয়া যায়, যখন তাঁকে ব্যক্তিগত কাজে রাজশেখরের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের অফিসে যেতে হয়েছিল, ''নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি (এ পোশাক ছাড়া তাঁকে কখনও অন্য পোশাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না)। হাতে কাগজের ফাইল, গম্ভীর প্রসন্ন মুখ... কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি যেমন আমাদের বেশিরভাগ লোকেরই অভ্যাস— তাঁকে দু'একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছু মাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন— ওসব কথা তো আপিসের নয়, আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন— এই বলে নিজের কাজে মন দিলেন'' (কথা সাহিত্য রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা, ১৩৬০)।

তাঁর এই চরিত্রলক্ষণ তাঁর পরিধেয়র মতোই আজ বাঙ্গালি জীবন ও চরিত্র থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। তবে আনন্দের কথা, তাঁর গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও পরে তাঁর নিজ হাতে পরিমার্জিত বাঙ্গালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত সামগ্রীর সম্ভারগুলি আজ সারা ভারতে পুনরায় সমাদৃত হচ্ছে। তাঁর কর্মধন্য প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধরে অজস্র ঘাত-প্রতিঘাত সামলে এই বিজ্ঞাপনের আগ্রাসনের বাজারে তাদের নিত্য ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে আবার জনপ্রিয় করে তুলে প্রতিষ্ঠানকে লাভের মুখ দেখাচ্ছে। রাজশেখরের প্রতি এও এক ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

যাই হোক, এটি রাজশেখরের পুঁথিগত শিক্ষা, ব্যক্তি চরিত্রের গঠন ও অননুকরণীয় কর্ম প্রতিভার পরিচয়। কিন্তু এটি তো তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন দিক। তিনি তো নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে। কী করে সঠিক অর্থ মেনে বিদ্যাচর্চা করা যাবে— অভিধান রচনা করতে হবে। ভারতের খনিজ দ্রব্যের সন্ধানে নেমে পড়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তাঁর চরিত্রের দিকে নজর করলে দেখা যায়, রাজশেখর ছিলেন সর্বার্থেই এক বহুমুখী প্রতিভা। ফলে বহুমুখী প্রতিভাধরদের এক ধরনের বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। বিভিন্ন দিক থেকে আকর্ষণ আসে। বহু ধরনের সৃষ্টির পথ তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারে। রাজশেখর তথা পরশুরাম এমনই এক সব্যসাচী ব্যক্তিত্ব। এক হাতে তিনি বিলিয়েছেন— অনাবিল রসভাণ্ডার, অন্যহাতে সৃষ্টি করেছেন মননশীল গল্প। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, অভিধান, কী নয়?

১৯২২ সালে 'গড্ডলিকা' নিয়ে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এই গল্পের বিষয়বস্তু বাঙ্গালি পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অসামান্য কৌতুক। গল্পের ভাষা সাধু চলিতের আশ্চর্য সংমিশ্রণ। তবে এটা নিশ্চিত যে, কিছুটা শিক্ষা দীক্ষা ও রসবোধ না থাকলে এ গল্পের অন্দরমহল অনাস্বাদিতই থেকে যাবে। রাজশেখর বসু তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরি, আইন বিদ্যা সর্বোপরি দুর্লভ রসবোধ ও অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে প্রথম অবির্ভাবেই মাত করেছেন। আজীবন কলকাতাবাসী হওয়ায় তাঁর লেখায় ছিল একেবারে নতুন এক আর্বান আমেজ।

গড্ডলিকার প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', আদতে

পরশপাথর গল্পের সত্যজিৎ-কৃত চলচ্চিত্রায়ণ।

কোম্পানি আইনের মাধ্যমে সুচতুরভাবে লোক ঠকানোর গল্প। ঠকাতে গেলে যা কিছু ভড়ং অর্থাৎ উপকরণ লাগে লেখক তা সফলভাবে এখানে উপস্থিত করেছেন। মানুষকে প্রলোভিত করতে একটি কোম্পানি তার ঘোষণাপত্র জারি করছে। 'ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন— ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র, বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।'

আমাদের বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলে এখনো যেমন ফর্জি কোম্পানি লোকের টাকা লুঠ করে, ঠিক সেভাবেই পরশুরাম নিজস্ব ব্যঙ্গচ্ছলে কোম্পানির সম্ভাব্য আয়ের রাস্তার বর্ণনা দিচ্ছেন। প্রথমে বলা হিন্দুধর্মের সূত্রেই এই কোম্পানি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মন্দির নির্মাণ করবে। এই মন্দির থেকে সংস্থা কীভাবে লাভের মুখ দেখবে তার সবিস্তার পরিকল্পনা 'যাত্রীগণের নিকট হইতে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে (রাজশেখরের রসায়ন বিদ্যা)। মায়ের সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদি বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রিত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগল সমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।' কল্পনার এমন অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যে আর দৃষ্ট নয়।

রাজশেখরের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ upstream ও downstream সংস্থা সংবলিত মন্দির তৈরির ব্যবসার প্রস্তাব কী মসৃণ কৌশলে জনমানসে পরিবেশিত হচ্ছে। মাতৃভাষা হিন্দির সঙ্গে অবাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মিশ্রিত বাংলায় আজও যে হাসির উদ্রেক হয় তার অব্যর্থ প্রয়োগ জানতেন রাজশেখর। তিনি এই মানুষগুলিকে নিত্য ডালহৌসির অফিস পাড়ায় বা নিজের অফিসে যাতায়াত করতে দেখেছেন। গল্পেরই একটি চরিত্রের নাম গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া। তাঁর সংলাপ 'অটলবাবু আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পড়িয়ে হামাকে ধরম কী শিখলাবেন। বঙ্গালি ধরম জানে না হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন (পুণ্য) ভি করে হিসাবেসে। রবীন্দরনাথ ভি লিখছেন। বৈরাগ্য সাধন মুক্তি সো হমার নঁহি।' প্রত্যেকটি অক্ষর লক্ষ্য করলে একটি ক্রূর মাড়োয়াড়ির অবয়ব চোখের সামনে দেখা যায়।

রাজশেখরের সংলাপ লেখা ও চরিত্র নির্মাণে একটা অব্যর্থ সিনেমাটিক সংকেত থেকে যেত। সত্যজিৎ সেই ৬০ বছর আগে এই অবাঙ্গালি সংলাপ ব্যবহারের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন রাজশেখরের 'পরশপাথর' নিয়ে ছবি করে। সেখানে পাথর হাতাতে মাড়োয়ারি গঙ্গাপদ বসুর চূড়ান্ত অর্থলোলুপ সংলাপ বড় অংশ জুড়ে ছিল।

'কাঁচি দিয়া ঘাঁটিতেছে' — বিরিঞ্চিবাবা।

কিংবা আরও পরে বিরিঞ্চিবাবার সীমাহীন গুল ভিত্তিক 'কাপুরুষ মহাপুরুষ'-এর চলচ্চিত্রায়ন। এখানে অনায়াসে বিরিঞ্চি তার অনাদিকালের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে অক্লেশে ভেঙে দিচ্ছে ইতিহাসের পাঁচিল। নিবারণের প্রশ্নের উত্তরে বিরিঞ্চি বলছে, 'কোথায় যেন দেখেছি তোমায় নেপালে? নাঃ মুরশিদাবাদে। তোমার মনে থাকার কথা নয়। জগৎশেঠের কুটিতে, তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিন। অনেক লোক ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নবাবের সেপাইশালার খান খানান মহব্বৎ জং, সুতোনুটির আমিরচাঁদ হিস্ট্রিতে যাকে বলে উমিচাঁদ। তুমি শেঠজীর খাজাঞ্চী ছিলে, তোমার নাম ছিল— রোস— মতিরাম।' এই পর্বে তিনি মোটামুটি ২৫০ বছর অতিক্রম করেছিলেন অবলীলায়। এবার বিরিঞ্চি বললেন, 'একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত (মনু) আমায় বললে— নীললোহিত কল্পে কী? না শ্বেতবরাহ কল্প সবে শুরু হয়েছে, বৈবস্বত বললে মানুষ তো সৃষ্টি করলুম কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কী? চারদিকে জল থৈথৈ করছে। আমি বললুম, ভয় কী বিবু, আমি আছি। সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে, সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্র-সূর্য চালাবার ভার আমার ওপরই কিনা।' ওঃ।

এখানে লক্ষণীয়, 'চোঁ' শব্দটি। বিরিঞ্চি যত প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তিত্বই হোক না কেন সে তার নিছক বাঙালি পরিচয় কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। পরের বাক্যটি অমলিন কৌতুক। কিন্তু আদি কল্পারম্ভের যে উল্লেখ পরশুরাম করেছেন তা গভীর অধ্যয়নলব্ধ এবং পৌরাণিকভাবে প্রামাণিক। তাঁর বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ তাঁকে বহু বিষয়ে নিবিড় পাঠে আকর্ষিত করেছিল। কিন্তু সাহিত্যের জগতে বহু ক্ষেত্রে যে কথা চলে আসে যে ব্যঙ্গরচনায় একবার খ্যাতি হয়ে গেলে লেখকের একটি মানসমূর্তি পাঠকের মনে গাঁথা হয়ে যায়। তাঁর অন্যান্য বহু কীর্তিই সেই মূর্তির আস্তরণে চলে যায়। গড্ডলিকা কজ্জলীর পরিশীলিত প্রহসনগুলি পাঠে অমৃতলাল বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পরশুরামকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। প্রমথ বিশী লিখেছেন, 'গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। এমন পরিচ্ছন্ন বাহুল্য বর্জিত সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার এই পদক্ষেপ সত্যিই বিস্ময়জনক। বস্তুত, পড়বার সময় খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কী কথ্য, পরে হিসেবে দেখা যায় সাধু ভাষা।'

বাংলা সাহিত্যে এই চমৎকারিত্বের পথিকৃৎ রাজশেখর। যেখানে পাঠককে তাঁর ভাষার সাবলীলতায় তিনি কখনো মূল পাঠ থেকে, বিষয় থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে ভাষার ছ্যুতমার্গে ফাঁসিয়ে দেন না। রাজশেখর নিজেকে তৈরি করেছিলেন তিলে তিলে অন্তরালে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ গড্ডলিকা তাঁর ৪২ বছর বয়সে প্রকাশ পায়। যে সময়কে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকেই তখন পশ্চাদপসরণের পর্ব হিসাবে ভাবত।

১৯২২ সালের পরের বছরগুলি কখনো পরশুরাম হিসেবে কখনো রাজশেখর হিসেবে তিনি অতি দ্রুত খ্যাতির শিখরে চড়েছেন। তাহলে কী তাঁর আগে বাংলা কৌতুক সাহিত্যের তেমন চল ছিল না। এমনটা ঠিক নয়। পরশুরামের গড্ডলিকা ও কজ্জলীর লেখাগুলি তো মূলত প্রহসনধর্মী। সেখানে হাসিকে ব্যবচ্ছেদ করলে কিন্তু সমাজের প্রতি প্রচ্ছন্ন তিরস্কারই উঠে আসবে। যেমন বিরিঞ্চি বাবার মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভক্তকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে সেই ১০০ বছর আগেও অর্থনৈতিক দুর্নীতির উন্মোচন। 'চিকিৎসা বিভ্রাটে'র বিষয়টি তো আজও প্রাসঙ্গিক। পরশুরামের ভাষা, পরিশীলিত উপস্থাপনা ও বিষয় নির্ধারণ বাঙালিকে মোহিত করে দেয়। আগের ব্যঙ্গ রচনাগুলি ম্যাড়মেড়ে হয়ে পড়ে। আজকাল মানুষের অসুস্থতার ক্ষেত্রে ডাক্তার নির্বাচন, হসপিটাল পরিষেবার সঠিক হদিশ পাওয়া একটা আলোচ্য বিষয়। এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে রোগীর ওপর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলির দৌরাত্ম্য। হাস্যরসের প্রধান উপকরণ মানব জীবনের বৈসাদৃশ্য সংবলিত পরিস্থিতির যথাযথ উপস্থাপন। তাঁর চিকিৎসা সংকট গল্পটির কিছুটা উদ্ধৃতি তাঁর বিতরিত হাস্যরসের অনবদ্য উদাহরণ।

আদি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা নন্দবাবু তৎকালীন হগ মার্কেট

'হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে'— চিকিৎসা সঙ্কট।

থেকে বাড়ি ফেরার পথে ধুতির খুঁট জড়িয়ে ট্রাম থেকে পড়ে যান। বাড়িটি যথারীতি হরিহর ছত্রের মেলা। মাঝবয়সী নন্দ বিপত্নীক। পিসিকে নিয়ে পৈতৃক আবাসে থাকেন। তাঁর আঘাত কিন্তু আদৌ গুরুতর নয়। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব নিরুদ্বেগ নিপাট ভদ্র বাঙ্গালি সমাজের একটি শান্ত ছবি বারবার রাজশেখরের লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে বৈঠকি আড্ডার একটা বড় ভূমিকা বারবার দেখা গেছে। এক্ষেত্রে ১৪ নং পার্সীবাগান লেনে তাঁদের বাড়ির বৈঠকখানার জমজমাট আড্ডার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। রাজশেখর স্বভাব মিতবাক হলেও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন আড্ডাধারীদের। নন্দবাবুর বৈঠকখানা এমনই গুলজার হয়ে আছে। সেই সদ্য বিকেল হয়েছে কী হয়নি ষষ্ঠীবাবুর মাথায় বালা ক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি ও তার ওপর মাফলার। তিনি আশ্চর্য মতামত দিলেন, 'বাপ, এত শীতে অবেলায় কখনো ট্রামে চড়ে! শরীর অসাড় হলে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।' বুঝুন! চিকিৎসা সংক্রান্ত তীব্র বাদানুবাদের পর ডাক্তার তফাদার এম. ডি. এমআরএএস-কে দেখানো স্থির হইল। তফাদার আরও কয়েকদিন নজর রাখা সাপেক্ষে cerebral tumour with strangulated ganglia ডায়গনোস করলেন। সঙ্গে বললেন, ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্রপচার করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। নন্দ শুধু বলল, বাঁচব তো? ডাক্তারের সান্নিধ্যে রুগী আতঙ্কিত। তফাদার নিপাট বাঙ্গালিকে খাদ্য হিসেবে দিলেন এগ ফ্লিপ, বোনম্যারো স্যুপ, চিকেন স্টু বিকেলের দিকে বার্গাণ্ডি খাওয়ার বিধান। সঙ্গে দিনরাত বরফ জল।"

পরবর্তী পরামর্শ অনুযায়ী নন্দ হোমিওপ্যাথ নেপাল সন্দর্শণে গেল। এখানে পরিবেশ আরও রহস্যময়, 'চারিদিকে স্তূপাকার বই সাজানো। বইয়ের দেওয়ালের মধ্যে গল্পে বর্ণিত শেয়ালের মতো মাটিতে বসিয়া আছেন বৃদ্ধ নেপালবাবু। মুখে গড়গড়ার নল। ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।'

নন্দের ব্যারামটা কী আন্দাজ করছেন প্রশ্নে নেপাল বলিলেন, 'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরোবে নাকি! যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস হয়েছে কিছু বুঝবে?' আরও এক প্রস্থ বিচিত্র পথ্যের আদেশনামা নিয়ে নন্দ ফেরত আসে। এরপর কবরেজি থেকে তৎকালীন দিনে চলিত মুসলমানি হাকিমি চিকিৎসার অসামান্য মজাদার পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নন্দের চিকিৎসার বন্ধুর পথ শেষ হয়।

এই পর্বে পরশুরাম বেআব্রু করে দেন ডাক্তারদের রুগীর প্রতি অবহেলার ধারাবাহিক রূপ। তাঁর অতি বিখ্যাত মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ, ভুশণ্ডীর মাঠে, বিরিঞ্চিবাবা, কচি সংবাদ, উলটপুরাণ প্রভৃতি প্রতিটি লেখাতেই নিছক ক্ষণিক হাস্যরস বিতরণেই ইতি ঘটেনি। তিনি প্রতিটি গল্প ও প্রহসনের মধ্যেই সমাজের বেখাপ্পা দিকগুলির প্রতি আঙুল তুলেছেন। তাঁর ব্যঙ্গই মধুর তিরস্কারধর্মী।

পরশুরামের পূর্বসুরী ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মূলত গ্রামীণ পরিবেশভিত্তিক হাসির গল্প বহু লিখেছেন। যার মধ্যে 'ডমরু চরিত' বিখ্যাত। যেখানে মানুষ বাঘের পাকস্থলীতে বসেও তার অনুভূতির কথা প্রকাশ করছে। এমন অতি স্থূল হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টাও রয়েছে। তিনি নিজেই লিখে গেছেন, 'ভালরূপ লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে সত্য ও পরোপকার ইহাই ধর্ম।'

হাসির গল্পের ঈর্ষণীয় সাফল্য ও জনপ্রিয়তা পরশুরামকে

পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। স্বজাতির উপকারই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দিষ্ট।

অফিসের চাকরিতে স্বদেশি দ্রব্যের বেশি বেশি আধুনিকীকরণ ও তার বাজারে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা যাকে 'রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট' বলা হয়, রাজশেখর তাতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়কেতু বসুর লেখা থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালে সুগন্ধী এসেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে রাজশেখরের একেবারে নিজস্ব পদ্ধতির কথা জানা যায়। এমন আধুনিক বিদেশি সুগন্ধির দিশি রূপান্তরকার কিন্তু সাহিত্যিক গজেন্দ্রনাথ মিত্রের কথায়, 'লোকে বলে খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা। আমি বলি 'ব্রিটিশ স্বাদেশিকতা' থাকায় বিদ্যাসাগর চাদর গায়ে চটি ফটফটিয়ে লাটসাহেবের কাছে যেতে পেরেছেন। ব্রিটিশ স্বাদেশিকতা ছিল বলেই এই অজস্র ফাউন্টেন পেনের যুগে রাজশেখর বসু আমৃত্যু লিখে গেছেন নিজের হাতে কাটা খাগের কলমে।'

এই স্বদেশিয়ানা ভাব থেকেই তিনি সর্বদা চেয়েছেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি ছেলেরা স্বাধীন ব্যবসা করুক। মধ্যবিত্ত শ্রমবিমুখ বাঙ্গালি সদা আশঙ্কিত থাকে ব্যবসায় যোগ দিলে তার সংস্কৃতি ও সুকুমার বৃত্তি সঙ্কুচিত হবে। রাজশেখর সামগ্রিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের উচ্চশিখরে থেকেও তাঁর সমগ্র জীবনের মাধ্যমে সাহিত্য সংস্কৃতির পথে বহুবিধ আলোকবর্তিকার দ্যুতিতে সেই আশঙ্কাকে মিথ্যে করে দিয়ে গেছেন। রাজশেখর বিশ্বাস করেছেন পুরুষাকার ও নিষ্ঠায়।

১৯৩০ সালে বিপুল পরিশ্রমে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনায় বের করেছেন বাংলা অভিধান চলন্তিকা। স্বদেশ ভাবনায় জারিত কুটির শিল্পের প্রসার বাড়াতে বিশ্বভারতী প্রকাশ করে তাঁর 'কুটির শিল্প' (১৯৪৪)। খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন ও তার পরিশোধনের ক্ষেত্রে ব্যবসার যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল তাই নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন 'ভারতের খনিজ'। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বাঞ্চল ও বিহারের অধিকাংশ কয়লা, অভ্র বা তামার খনির ব্যবসায় বাঙ্গালির বিপুল প্রাধান্য ছিল। গল্পে ছোটদের নিয়ে তেমন বিষয়বস্তু না থাকলেও তাদের জন্য হিতোপদেশের গল্প ধারাবাহিকভাবে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারতের অত্যন্ত সহজ অনুবাদ করেন। গ্রন্থে মূল গ্রন্থের স্থান, ব্যক্তি, অস্ত্রাদির বিশদ বিবরণ পর্যন্ত তিনি দিয়ে দেন। ফলে তাঁর গ্রন্থগুলি একাধারে মানে বইয়েরও কাজ করত। হাসির গল্প ছাড়া তিনি অন্যান্য বহু অত্যন্ত মনীষাপ্রসূত গল্প লিখে গেছেন। গল্পকল্প, ধুস্তুরী, মায়া, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি তাঁর বহু বিচিত্র স্বাদের গল্প গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র। সমাজের নানা অসঙ্গতিকে দূর করার মনোজ্ঞ পরামর্শ সেখানে বিদ্যমান। । তবে এর মধ্যে 'গা মানুষ জাতির কথায়' রাজশেখর যে উদ্ভাবনী মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার ক'টি পঙক্তি তুলে ধরছি। সমগ্র বিশ্বে দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে দীর্ঘস্থায়ী এক অশান্তি ও সামরিক বিস্ফোরণের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, তা থেকে নিস্তার পেতে রাজশেখরের বৈজ্ঞানিক লিখছেন, 'প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আমার আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা তার প্রভাবে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এই বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হয় তা cosmic রশ্মির চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম ক্রোধ লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি হয়।' এমন মৌলিক ভাবনা এমন লঘুচালে পরিবেশন বিরল। রাজশেখরের নিরলস বিদ্যানুরাগ, দেশহিতৈষণা ও সাহিত্য চর্চায় মুগ্ধ হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অন্যতম সদস্য করে নিয়ে যান। পরিভাষা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৩৪-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৪০ সালে তাঁকে বিখ্যাত 'জগত্তারিণী পদক' ও ১৯৪৫ সালে 'সরোজিনী পদক' দানে সম্মানিত করে। মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে ১৯৫৭ সালে তাঁকে ডি'লিট উপাধি দেওয়ায় তিনি বিশেষ খুশি হতে পারেননি। চিরকালীন সোজা সাপটা রাজশেখর বন্ধু কুমারেশ ঘোষকে লেখেন, '৭৭ বছর পেরিয়ে উপাধি লাভে কিছুমাত্র আনন্দের কারণ নেই। আর ডাক্তার উপাধি তো গড়াগড়ি যাচ্ছে।' (যষ্ঠিমধু, রাজশেখর সংখ্যা)

অত্যন্ত দেরিতে হলেও ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়। ১৯৫৬ সালে রাজশেখর পদ্মভূষণ উপাধি পান। ১৯৫৮ সালে অসাধারণ 'আনন্দবাঈ' গল্পের জন্য তিনি অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

অনেক ক্ষেত্রেই রাজশেখরকে নিরিশ্বরবাদী বা হিন্দুধর্মবিমুখ এমন একটা তকমা দেওয়া হয়। সে বিষয়ে তিনি তাঁর সৃষ্ট এক চরিত্র সাধু 'জাবালির' জবানিতে বলেছেন, 'আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি। আমার তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাঁদের বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনো প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তন সহ।'

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মতো সংবেদনশীল বিষয় তিনি এড়িয়ে যাননি। 'একজন আরবি, পারসিক বা মিশরি মুসলমান স্বদেশের প্রাক ইসলাম সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে দ্বিধা করে না। তবে ভারতীয় মুসলমানরাই বা কেন রামায়ণ মহাভারত, বেদ উপনিষদকে দূরে সরিয়ে রাখবে? ... ওই সমস্ত দেশের প্রাক ইসলাম ধর্মগুলি মৃত, তাই তাদের চর্চাও নিরাপদ। অন্যদিকে ভারতীয় ইসলামের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুত্ব এখনও জীবন্ত ও যথেষ্ট শক্তিশালী, তাই মুসলমান হয়ত আকর্ষণ বা অনুপ্রবেশের ভয়ে একটু দূরে থাকতে চায়। এ ভয় অমূলক। আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু

যৌবনে রাজশেখর

প্রাচীন সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য অন্ধভাবে গ্রহণ করে না, যা যুগোপযোগী তাই বেছে নেয়। আধুনিক, শিক্ষিত মুসলমানও তাই করবে। যদি তার বাছার পদ্ধতি একটু অন্যরকমও হয়। কিন্তু আদান-প্রদান একতরফা হলে চলবে না।'

বাস্তবে মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ হলে আমরা কী আজও সদা গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকি? দেবতার উদ্দেশে পশুবলি তো অনেকাংশেই রদ হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে উপনয়ন হলে ছেলেটি কি এখনও তিনদিন অন্য বর্ণের মুখ দর্শন করে না? কালপ্রবাহ কুপ্রথাকে গ্রাস করে নেয়। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি।

রাজশেখর অনুধাবন করেছেন কালের গতি। তির্যক অবলোকন ও অভ্রান্ত শ্লেষের লেখনী ব্যবহারে সমাজকে আবর্জনামুক্ত করতে চেয়েছেন এই আধুনিক পরশুরাম। তাঁর ব্যঙ্গ রচনা সমেত বিস্তর লেখালিখিতে বিকল্পের নানা সংকেত ছড়িয়ে আছে। তবুও দক্ষিণেশ্বরে মূল আরাধ্যা মা কালী ছাড়া আশপাশে যেমন আরও বহু দেব-দেবীর অধিষ্ঠান, পরশুরামের বহুবিধ লিখনের মধ্যে তার ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলিই অগ্রগণ্য।

তাই, প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য গৃহস্থালির যে অমোঘ যোগসূত্র বা দৈনন্দিনতার সঙ্গে চিরন্তনের যে অনন্ত দেওয়া-নেওয়া তারই অনিবার্যতার পদসঞ্চার শোনান প্রকৃতি প্রেমিক পরশুরাম। বর্ষা অবসানে তাঁর নিজস্ব শরতের আগমনী এমনই — 'চৌরঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। খোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় একগণ্ডা রোগা রোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে।"

সূত্র :

১। পরশুরাম গ্রন্থাবলী, আনন্দ

২। কজ্জলী - এম সি সরকার

৩। যষ্ঠিমধু - কুমারেশ ঘোষ

৪। প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গ্রন্থাবলীর ভূমিকা।

With Best Compliments from :-

ALL INDIA CONFEDERATION OF SMALL & MICRO-INDUSTRIES ASSOCIATIONS

LGF, 10/6,A, Nehru Enclave, Kalkaji Extension,
New Delhi - 110019
Tel. : 011-26210104, Mobile : 09811661134
Email : aicosmia@yahoo.co.in

SOCKS FOR STYLE DOWN TO YOUR FEET

Quality Products

B. K. International (P) Ltd.

Badli Gaon

DELHI-110 042

Phone : 2785-7039, 27857067 I Fax No.: 2785 7066

G. B. Auto Industries (Regd.)

Leading Mfr : Exporters & Largest Suppliers of

Rickshaw Hub, B. B. Shells (Bi-cycle Parts) & All Type of Lastings

C-84, Focal Point, Phase-V

Dhandari Kalan

Ludhiana - 141 010

Office : 0161-2671700, 2671600, 2677500

Fax : 0161-2671500,

M : 094172-71500, 098772891700

E-mail : gbskg@yahoo.in

gbautoind@yahoo.co.in

Web : www.gbautoindustries.com

With Best

Compliments from :-

AURO MECHANICALS

An ISO 9001 : 2000 Certified Firm

Mfrs. & Expoters of Hardware Nuts & Bolts, Hi-Tensile Fasteners

Auto Parts, Sheet Metal Components

B-20, Bhagwan Mahavir Industrial Complex, Backside Focal Point Sheds

Ludhiana - 141010

Tel. 0161-4610141

M.: 9814000141

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান

কল্যাণ চৌবে

শূন্য আবিষ্কারের দ্বারা গণিত শাস্ত্রে আর্যভূমি ভারতবর্ষের কী অবদান ছিল এবং এর ফলে পৃথিবীতে যে কী বিশাল পরিবর্তন হয়েছে সেকথা আজ সকলেই স্বীকার করে। ঠিক তেমনই আয়ুর্বেদের মাধ্যমে পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। আজ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জন্মভূমি, কর্মভূমি ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ বর্তমানে প্রথম বিশ্ব হিসেবে পাশ্চাত্যের যে দেশগুলিকে বোঝায়, দুই-তিন হাজার বছর পূর্বে তারা যখন সবে গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে যাওয়া দেখে চাকা আবিষ্কার করছে, সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষরা জ্যোতিষ শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্বর বখতিয়ার খিলজি অথবা হিংস্র মুঘল জঙ্গি সম্রাটদের অত্যাচারে যদি অজস্র মন্দির, হিন্দু দেবস্থান, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা তথ্যগুলি ধ্বংস করা না হতো তাহলে আজ অবশ্যই আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে ডাকার স্পর্ধা কারোর হতো না। এই উপলক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কয়েকজন স্রষ্টার নাম এখানে উল্লেখ করা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হবে—

শুশ্রুত :— মহর্ষি শুশ্রুতকে চিকিৎসা বিদ্যার জনক বলা হয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে কাতর হয়ে দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরিকে পৃথিবীতে জন্ম নিতে বলেন। দেবরাজের নির্দেশে ধন্বন্তরি কাশীধামে কাশীরাজের গৃহে পুত্র রূপে জন্ম লাভ করেন। তাঁর নাম হয় দিবোদাস। শুশ্রুতের পিতা বিশ্বামিত্র ধ্যান যোগে বিষয়টি জানতে পেরে শুশ্রুতকে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের জন্য দিবোদাসের কাছে পাঠান। ধন্বন্তরির কাছে শিক্ষা লাভ করে শুশ্রুত চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 'শুশ্রুত সংহিতা'। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাচীনতম এই গ্রন্থে চিকিৎসা বিদ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) সূত্র স্থান, ২) শরীর স্থান, ৩) চিকিৎসা স্থান এবং ৪) কল্পস্থান। এই চারটি বিষয় বিচার করেই রোগের লক্ষণ, রোগের কারণ, চিকিৎসার উপকরণ, পদ্ধতি ও ভেষজ পদার্থের গুণাগুণ ও মানবদেহ সম্পর্কিত নানা তথ্য পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে বলা আছে। এই গ্রন্থে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, মহর্ষি শুশ্রুত আনুমানিক দশম শতাব্দীতে কাশী নগরীতে বসবাস করতেন এবং চিকিৎসক হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনিই পৃথিবীর প্রথম শল্য চিকিৎসক যিনি ভাঙা হাড় জুড়তে পারতেন। তাঁর গ্রন্থে শল্য চিকিৎসার শতাধিক পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে। প্রাচীন বারাণসীর গঙ্গার তীর থেকে চিকিৎসক শুশ্রুতের চিকিৎসা বিজ্ঞান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর নানা প্রান্তে যারা আয়ুর্বেদ পাঠ করেন, তাঁদের কাছে শুশ্রুত সংহিতা আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে পরিচিত। শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে মানসিক সম্পর্কের বিষয়টাও বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে এই গ্রন্থে। যেমন রোগী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে চিকিৎসকের আচার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত। মনস্তাত্ত্বিক কারণেও রোগীর দ্রুত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনার প্রতি দীর্ঘ আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে যখন হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহের বিষয়টি প্রায়শই সংবাদের শিরোনাম হয় তখন শুশ্রুত সংহিতার কথা মনে পড়ে।

চরক :— চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর এক ভারতীয় স্রষ্টার নাম হলো চরক। ঐতিহাসিকরা মনে করেন আনুমানিক তিন'শ শতকে চরক জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ভগবান বিষ্ণু যখন মৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হন, তখন অনন্তদেব অথর্ব বেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ বিদ্যা লাভ করেন। রোগক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের কষ্ট উপশমের জন্য তিনি ছদ্মবেশে অর্থাৎ 'চর' রূপে পৃথিবীতে আবিভূত হন। তাই তার নাম 'চরক'। মুনিপুত্র রূপে মঠ-ধামে আবিভূত চরক মানুষের চিকিৎসা করতেন। তাঁর রচিত 'চরক সংহিতা' চিকিৎসা শাস্ত্রের এক অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী বিভিন্ন বৈদিক চিকিৎসকদের জ্ঞান ও তার নিজের অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে। বলা যেতে পারে, বৈদিক যুগের যাবতীয় চিকিৎসা বিদ্যাকে তিনি তাঁর গ্রন্থে সংযুক্ত করেন।

চরক সংহিতা আটটি ভাগে বিভক্ত— (১) সূত্রস্থান (২) নিদানস্থান (৩) বিমানস্থান (৪) শরীরস্থান (৫) ইন্দ্রিয়স্থান (৬) চিকিৎসাস্থান (৭) কল্পস্থান (৮) সিদ্ধিস্থান।

চরক হৃদপিণ্ডকে বলেছিলেন মানবদেহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ১৩টি পথে যা শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মানবদেহের ৩৬০টি অস্থির কথাও বলেন তিনি। চরকই প্রথম চিকিৎসক, যিনি মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা বলেন। মানবদেহের কার্যকারিতার ফলে তিনটি 'দোষের' কথা উল্লেখ করেন। তা হলো— বাত, পিত্ত ও কফ। তিনি বলেন, প্রধানত এই তিনটি জিনিসের ফলেই মানুষের শরীর অসুস্থ হয় এবং তা ধীরে ধীরে কঠিন রোগের জন্ম দেয়। সে কারণে শরীর থেকে এই তিনটি ব্যাধিকে দূর করা প্রয়োজন। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য চরক একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন মানুষকে। তা হলো, মানব শরীরে রোগ হলে চিকিৎসা করার আগে চেষ্টা করা উচিত যেন রোগের প্রকোপে না পড়তে হয়। অর্থাৎ 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যন কিওর।' এই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তিনি ব্যাভিচারহীন ধার্মিক জীবনযাত্রা, পরিমিত নিরামিশ আহার, সংযত জীবন ও সুরা পান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। শরীর সুস্থ রাখার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় নিদ্রা ও যোগব্যায়াম চর্চার কথাও বলেন। রোগ থেকে শরীরকে দূরে রাখার জন্য যে আধুনিক 'টিকা' বা প্রতিষেধক গ্রহণ করা হয় তার ভাবনা কিন্তু লুকিয়ে ছিল মহর্ষি চরকের এই চিন্তাধারার মধ্যেই।

পতঞ্জলি :— মহর্ষি চরক যে যোগাভ্যাসের কথা বলেছিলেন, সে বিষয়ে বলতে আর এক মহাঋষির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। তিনি পতঞ্জলি। শরীর সুস্থ রাখা এবং রোগ দূর করার জন্য তিনি যোগাভ্যাস সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈদিক যুগে আর্যাবর্তের ঋষিরা নিয়মিত যোগাভ্যাস করতেন। যে কারণে রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা কয়েকশো বছর পর্যন্ত জীবনধারণ করতে পারতেন। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যোগদর্শন

মহর্ষি শুশ্রুত

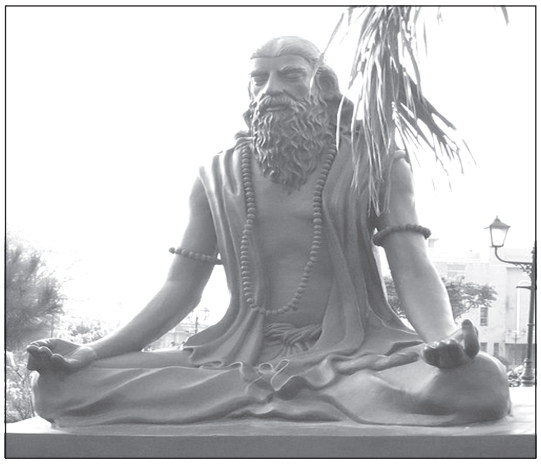

মহর্ষি চরক

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দু যোগদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ 'যোগসূত্র', সংকলক ছিলেন পতঞ্জলি। পানিনির বিখ্যাত 'অষ্টাধ্যায়ী'র ওপর ভিত্তি করে ঋষি পতঞ্জলি 'মহাভাষ্য' গ্রন্থ রচনা করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপরেও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐতিহাসিকদের অনুমান, শুশ্রুত ও চরকের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল পতঞ্জলির কার্যকাল। অষ্টম শতাব্দীর রচনাতে আমরা সে সময় আর এক পতঞ্জলিকে পাই, যিনি চরক সংহিতার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক 'চরক বর্তিকা' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' গ্রন্থে ১৬৯টি যোগসূত্র আছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি অন্তত ৪০টি ভাষাতে অনুবাদিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা থেকে। 'পতঞ্জলি' নামকরণের পিছনে পুরাণে উল্লেখিত একটি গল্প আছে। এক যোগিনী পুত্র সন্তানের কামনায় সূর্যদেবের তপস্যা করছিলেন দুটি হাত উন্মুক্ত করে ভিক্ষা চাইবার ভঙ্গিতে। হঠাৎ যোগিনীর মনে হয়, তার হাতে কী যেন একটা এসে পড়ল। চোখ খুলে তিনি দেখেন, তার হাতের মধ্যে একটি নাগশিশু। যে গাছের তলায় বসে তিনি তপস্যা করছিলেন হয়তো সেই গাছের ডাল থেকে পড়েছে। দেবতার দান মনে করে যোগিনী তাকে বলেন, 'তোমাকে আমি পালন করব'। তিনি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নাগ শিশু মানব শিশুর রূপ ধারণ করে। যোগিনীর উন্মুক্ত হস্ত বা অঞ্জলিতে তার পতন হয়েছে বলে যোগিনী তার পুত্রের নাম রাখেন পতঞ্জলি। পরবর্তীকালে সেই শিশু 'যোগসূত্র'র রচয়িতা মহর্ষি পতঞ্জলি নামে পরিচিত হন। ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সম্পূর্ণ রূপ হলো ভাগবৎ গীতা। বশিষ্ঠ মুনি, যাজ্ঞবল্ক ও পতঞ্জলির যোগসূত্র। যার পূজারি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তক্ষশিলা নগরীর গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মহর্ষি পতঞ্জলির নাম। তিনি একাধারে ছিলেন ভারতীয় যোগ দর্শনের প্রবর্তক, ব্যাকরণবিদ, দার্শনিক ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত।

বৈদিক যুগে আরও অনেক ঋষির রচিত চিকিৎসা শাস্ত্র সংক্রান্ত অমূল্য গ্রন্থ ছিল। ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে পণ্ডিত আরও অনেক ঋষি, চিকিৎসক। যেমন নাগার্জুন। শুশ্রুতের কিছু পূর্বে ছিলেন নাগার্জুন। চরক তার সংহিতা রচনা করার সময় নাগার্জুনের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। এছাড়া ছিলেন আত্রেয়, অগ্নিবেশ সহ আর কিছু চিকিৎসাবিদ গ্রন্থ রচয়িতা। প্রাচীন সংস্কৃক্ত পুঁথিতে যাদের উল্লেখ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে জ্ঞানের দীপ জ্বেলেছিলেন তাঁরা। তাঁরা কেউ শিখিয়ে ছিলেন শরীর অসাড় করে যন্ত্রণাহীন শল্য চিকিৎসার পদ্ধতি। আবার কেউ শিখিয়ে ছিলেন কীভাবে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হয় তার বিদ্যা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিকাংশ শিক্ষার সূচনাই এই সব মুনি-ঋষিদের দ্বারাই হয়েছে। এমনকী ঋষি শুশ্রুতের গ্রন্থে শব-ব্যবচ্ছেদের (পোস্ট মর্টেম) কথাও রয়েছে। শুশ্রুত সংহিতা মূল গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে 'চরক সংহিতা' অনুবাদ করা হয় আরবি ভাষাতে। বইয়ের নামকরণ করা হয় 'কিতাব শুশ্রুত এ হিন্দ' বা 'কিতাব এ শুশ্রুত'। বই দুটি এরপর এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতে আসা প্রাচীন ইউরোপিয়ানরাও নিজ নিজ দেশে বহন করে নিয়ে যান মহাঋষি শুশ্রুত, মহাঋষি চরক, মহাঋষি পতঞ্জলির চিকিৎসা বিজ্ঞানকে। আর তার আলোকেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ইউরোপের চিকিৎসা শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্রের নিগূঢ় বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হয় ইউরোপ, আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশ। মহাঋষি শুশ্রুতের ভেষজ চিকিৎসা বিদ্যা, মহাঋষি চরকের শল্যবিদ্যা, মহাঋষি পতঞ্জলির যোগ বিদ্যাই পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসা বিদ্যার মূল উৎস। যা বিকশিত হয়েছিল পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দু ধর্মকে অবলম্বন করে।

আজ আয়ুর্বেদ নিয়ে নানান বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছেন, খুঁজে চলেছেন বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ বা মেডিসিন প্ল্যান্টের কার্যকারিতা। কিন্তু আজ থেকে দু-হাজার বছর আগে বৈদিক ঋষিরা শতাধিক ঔষধি গাছ বা মেডিসিন প্ল্যান্টের নাম জানতেন। নির্দিষ্ট ভাবে তাদের গুণাবলীও জানতেন। ভাবা যায়!

(লেখক ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক)

মহর্ষি নাগার্জুন

মহর্ষি পতঞ্জলি

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station

Only 1 km. from Connaught Place

Homely Atmosphare

Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road
Ram Nagar,
New Delhi - 110055

Phones : 23622767, 23623398, 23618232

STD : 23530775, 23533398,23618232
Cont : 9811044543

E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in
Fax : 91-11-23636380

With Best Compliments from -

Redox Pharmachem Pvt. Ltd.

Office : C-46, Defence colony
New Delhi - 110 024
India

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters, Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans, Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

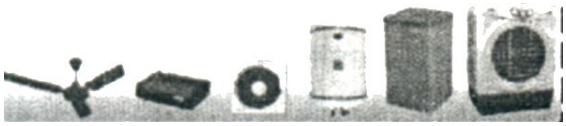

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

অমরত্ব

সিদ্ধার্থ সিংহ

সেই কোন ছোটবেলায় গল্পটা শুনেছিল নির্মল। একটা মানুষের অমর হওয়ার গল্প। মানুষটা যদি সত্যিই অমর হয়ে থাকেন, তা হলে তো তাঁর এখনও বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু তিনি কোথায়! তাঁর কাছে গিয়ে সে জেনে নেবে, কী করে অমর হওয়া যায়।

কিন্তু না। হাজার চেষ্টা করেও সে তাঁর খোঁজ পায়নি। যতদূর জেনেছে, ওই লোকটাই প্রথম এবং ওই লোকটাই শেষ। তাঁর আগেও কেউ অমর হয়নি, তাঁর পরেও না। অর্থাৎ উনি একা একাই অমর হওয়ার কৌশলটা বের করেছিলেন। তিনি যদি পারেন, তবে সে কেন পারবে না! কিন্তু কোথা থেকে হাঁটা শুরু করবে সে!

ইতিমধ্যেই সমস্ত জ্যোতিষী তার চষা হয়ে গেছে। কেউ ওর কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছেন, কেউ হেসে উঠেছেন, কেউ আবার ভেবেছেন, ছেলেটা নির্ঘাত কোনো পাগল। অমর হওয়ার সত্যিই যদি কোনো রাস্তা থাকত, তাহলে কি তাঁরা অমর হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন না!

নির্মলের মনে হলো, জ্যোতিষীরা যখন বলতে পারছেন না, তখন নিশ্চয়ই কোনো মন্ত্রতন্ত্র

আছে! যেটা উচ্চারণ করলেই অমর হওয়া যায়। ও একের পর এক কিনতে শুরু করল তন্ত্রমন্ত্রের বই। দিনরাত এক করে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে ও পেল কয়েকটা টোটকা। সূর্য ওঠার আগে সমপরিমাণ স্বর্ণচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ আর কালো গোরুর চোনা ভালো করে মিশিয়ে লেই করে, সেই লেই মুখে মেখে যার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে, মুহূর্তের মধ্যে সে সম্মোহিত হয়ে যাবে। পাওয়া গেল এমন মন্ত্র, কারও মুখ মনে মনে কল্পনা করে, সেই মন্ত্র মাহেন্দ্রক্ষণে একশো আটবার জপ করলেই সে যতই অপছন্দ করুক না কেন, তারপর থেকেই সে তাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। তার পিছু পিছু ঘুরবে। শত্রু হলেও ভক্ত হয়ে যাবে। পাওয়া গেল এমন মন্ত্রও, যে মন্ত্র মাঘী পূর্ণিমার মধ্যরাতে স্নান টান করে নতুন বস্ত্র পরে ধূপ ধুনো জ্বেলে সহস্র একবার জপ করলেই মানুষ তো কোন ছার, সমস্ত জীবকুল, দৈত্যকুল এবং ঈশ্বরকুলও বশীভূত হয়ে যাবে।

কিন্তু এসব তো সে চায় না। তাই ওগুলো কীভাবে করতে হয় বা করলেও আদৌ কোনো ফল পাওয়া যায় কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখেনি। সে চায় অমর হওয়ার চাবিকাঠি। কিন্তু না। তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওইসব বইয়ে সেরকম কিছুই পেল না সে। তবে কী প্রাচীন কোনো গ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে এর হদিশ!

মনে হতেই নির্মল ছুটল চোদ্দ পুরুষ ধরে তন্ত্রসাধনা করা সিদ্ধপুরুষ শ্যামাকান্ত তর্কালঙ্কারের বাড়ি। কিন্তু সেখানে গিয়ে ধুলোয় ঢাকা পাহাড় প্রমাণ বই ঘেঁটেও কোনো লাভ হলো না। খোঁজখবর করে হাজির হলো, দীর্ঘদিন তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা, নষ্ট হতে বসা তন্ত্রগ্রন্থের একমাত্র সংগ্রহশালায়। আঁশ বেরিয়ে যাওয়া, তুলো তুলো কাগজের এক একটা পাতা আলতো আলতো করে উল্টিয়েও সন্ধান পেল না তার, যেটা সে হন্যে হয়ে খুঁজছে। একদিন শুনল, পুকুরের মাটি কাটতে টাকতে কোথায় নাকি পাওয়া গেছে একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্যেই মিলেছে কতগুলো পোড়া মাটির বাসনপত্র, মূর্তি আর লোহার চেয়েও মজবুত মাটির একটা সিন্দুক। সেই সিন্দুকের ভেতরে পাওয়া গেছে একগাদা তালপাতার পুঁথি। কিন্তু ওগুলো যে কোন যুগের বোঝা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞের দল রওনা হয়ে গেছে।

পুঁথি! তালপাতার পুঁথি! তাও আবার পুরনো দিনের! খবর পাওয়ামাত্র সে ছুটে গেল সেখানে। কিন্তু ওইসব পুঁথি যে কোন হরফে লেখা, সেটাই উদ্ধার করতে পারল না বিশেষজ্ঞরা। পণ্ডিতেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ফলে ও হাল ছেড়ে দিল।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গেল তার। কোথাকার এক কবিরাজ নাকি কী একটা ওষুধ বের করেছেন। সেই ওষুধ টানা সাতদিন খেলেই আর চিন্তা নেই, মৃত্যুর জন্য হাঁসফাঁস করা যন্ত্রণাক্লিষ্ট কর্কট রোগীও একদম সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দূরদূরান্ত থেকে লোক ছুটে আসছে। প্রতিদিন সকাল থেকে লাইন পড়ে যাচ্ছে তাঁর বাড়ির সামনে।

খবরটা পড়ে নির্মল ভাবতে লাগল, সত্যি, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র এক সময় কত উন্নত ছিল। তখনকার চিকিৎসকরা প্রায় মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। প্রায় কেন? মরা মানুষকেও তো বাঁচিয়েছেন বহুবার। মনে নেই? শক্তিশেলে ঘায়েল হয়ে লক্ষ্মণ তখন মরো মরো, পাশেই ছিলেন বানর রাজবৈদ্য সুষেণ। তিনি বলেছিলেন, মৃতসঞ্জীবনী গাছের কথা। কোথায় পাওয়া যাবে, তাও বলে দিয়েছিলেন। সেই মতো এক লাফে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল হনুমান। কিন্তু কোন গাছটা যে মৃতসঞ্জীবনী, বুঝতে না পেরে পুরো গন্ধমাদন পাহাড়টাকেই তুলে এনেছিল সে। সুষেণ তখন ওই গাছের ক'টা পাতা ছিঁড়ে, হাতের তালুতে ডলে ক্ষতস্থানে লাগাতেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্মণ।

যে শাস্ত্র মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, সে শাস্ত্র কি জীবিত মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না! নিশ্চয়ই পারে। এই বিশ্বাস থেকেই সে আবার পড়তে শুরু করল চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, অথর্ব বেদ। অথর্ব বেদ পড়তে পড়তে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। আয়ুর্বেদে তখন নাক, কান, গলা, শিশুচিকিৎসা, আকুপাংচার, শল্যচিকিৎসা, এমনকী মনোচিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। এই জন্যই বুঝি আয়ুর্বেদকে বাংলা করলে দাঁড়ায় জীবন-জ্ঞান। জীবন-জ্ঞানই তো। আয়ু মানে যদি লাইফ হয়, আর বেদ মানে নলেজ, তার বাংলা তো জীবন-জ্ঞানই হবে, তাই নয় কী? উৎসাহিত হয়ে সে খুঁজতে লাগল স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, মগধের রাজা অজাতশত্রুর রাজবৈদ্য জীবক আর ধন্বন্তরীর মতো পণ্ডিত চিকিৎসকেরা কোনো ভূর্জপত্র বা তালপাতায় কিছু লিখে রেখে গেছেন কি না। হয়তো লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ও সেটা খুঁজে পেল না।

সেসময় অনেক চিকিৎসকই অনেক যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু অনেকেই সেগুলো লিপিবদ্ধ করে যাননি। যেমন প্রশান্ত খাস্তগির। বেশ কয়েক দশক আগে এ দেশে এক মহামারীর চেহারা নেয় ঢেপু জ্বর। সেই জ্বরে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হতে

লাগল। ঠিক তখনই ওই রোগ নিরাময়ের একটা মোক্ষম ওষুধ তৈরি করে ফেললেন এই দেশেরই এক চিকিৎসক— প্রশান্ত খাস্তগির। শুনেছি, তাঁর নামে নাকি একটা রাস্তাও হয়েছে কলকাতায়। তিনি নিজেই সেই ওষুধ বানাতেন। নিজের হাতেই রোগীদের দিতেন। কিন্তু কী কী দিয়ে বানাতেন, আর তার অনুপাতই বা কী, সেটা নাকি কাউকেই বলে যাননি তিনি। লিখেও রেখে যাননি কোথাও।

হয়তো অমর হওয়ার ওষুধও কেউ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এই প্রশান্ত খাস্তগিরের মতো তিনিও হয়তো তা লিখে রেখে যাননি। কিংবা লিখে রেখে গেছেন এমন জায়গায়, যেখানে এখনও মানুষের নাগাল পৌঁছায়নি। যে দিন পৌঁছবে, সে দিন হয়তো মাটির সিন্দুকে পাওয়া তালপাতার পুঁথিগুলোর মতোই সেটা যে কোন হরফে লেখা, সেটাই বুঝতে পারবে না কেউ। নাঃ, চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো বইতেই পাওয়া গেল না তেমন কিছু।

কিন্তু অমর শব্দটা যখন আছে, তখন সেটা পাওয়ার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা রাস্তা তো থাকবেই। সেটা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে সে? কার কাছে। কোনো সাধু সন্তদের কাছে! হ্যাঁ, তাঁদের কাছে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

নির্মল শুনেছে, তারাপীঠ নাকি খুব জাগ্রত। সেখানে প্রচুর লোক সাধনা করেন। তাহলে কি সেখানে ও একবার যাবে! গেলে হয়তো পাওয়াও যেতে পারে তেমন কোনো সাধু, যিনি ওকে বলে দিতে পারেন, অমর হওয়ার কোনো কৌশল। মনে হতেই বাক্সপ্যাঁটরা বেঁধে বেরিয়ে পড়ল নির্মল।

তারাপীঠে পা রাখতেই শিহরিত হলো সে। এখানেই তো সাধনা করেছিলেন বামাখ্যাপা! ভক্তিতে মন গদগদ করে উঠল। পুজোটুজো দিয়ে শ্মশানের দিকে হাঁটা দিল সে। দূর থেকেই দেখতে পেল, অজস্র ঝুরিটুরি নামা বিশাল একটা অশ্বত্থগাছের তলায় একজন বসে আছেন। মাথায় একগাদা জটাজুটো। কে উনি! তাঁকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগল তার। কিন্তু উনি যে কে, কিছুতেই মনে করতে পারল না। গুটিগুটি তাঁর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে, খুব আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে...'

— বল বেটা।

— বলছি, আপনি কি বলতে পারবেন, কী করলে অমর হওয়া যায়?

উনি আকাশের দিকে মুখ তুললেন। — সব তাঁর ইচ্ছে। তার পরেই গান ধরলেন— কারে দাও মা ব্রহ্মপদ / কারে

করো অধোগামী / সকলই তোমারই ইচ্ছা / ইচ্ছাময়ী তারা তুমি / তোমার কর্ম তুমি করো মা/ লোকে বলে করি আমি... জয় মা তারা, জয় মা, জয় মা... কাজ কর, কাজ কর... বলতে বলতে চোখ বুজলেন তিনি।

কাজ কর! সে কি কাজ করে না! প্রচুর কাজ করে। তবে, তার এখন সবচেয়ে বড়ো কাজ, কী করলে অমর হওয়া যায়, তার সন্ধান করা। যেভাবেই হোক, যার কাছ থেকেই হোক এটা তাকে জানতেই হবে।

নির্মল উঠতে গিয়ে দেখে, তার পেছনে একজন ভদ্রলোক, সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা আর দুটো বাচ্চা। ঠিক বাচ্চা নয়, একটা বালক আর একটা বালিকা। দেখে মনে হয়, এই ভদ্রলোকেরই বউ ছেলেমেয়ে। এরা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ও টের পায়নি। ও উঠতেই ভদ্রলোক বললেন, কী বলছেন বাবা?

— বলছেন, জয় মা তারা।

— ও।

ভদ্রলোক কথা বলতেই, ও কেমন যেন একটা ভরসা পেল। দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা দাদা, সবথেকে বড়ো সাধু কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

— সবথেকে বড়ো সাধু! কে ছোট কে বড়ো, এ বিচার কে করবে? তবে, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি যে ধরনের সাধু খুঁজছেন, সেরকম সাধু এখানে পাবেন না। হিমালয়ে হয়তো পেতে পারেন। শুনেছি, বড়ো বড়ো সাধুরা নাকি হিমালয়ের গুহায় যুগ যুগ ধরে সাধনা করেন।

— হিমালয়ে!

— না, আপনাকে হিমালয়ে যেতে বলছি না। কাছাকাছির মধ্যে কামরূপ কামাখ্যাতেও যেতে পারেন। ওখানে নাকি অনেক বড়ো বড়ো সাধু আছেন।

— কামরূপ কামাখ্যায়!

মনে মনে নির্মল ভাবল, শুধু কামরূপ কামাখ্যায় কেন? সামান্য একটা খুন, জালিয়াতি বা বিস্ফোরণের কিনারা করতে সিআইডি বা ভিজিলেন্সের লোকেরা যদি চীন, জাপান, আমেরিকা যেতে পারেন, তো কীভাবে অমর হওয়া যায়, এটা জানার জন্য কী সে হিমালয়ে যেতে পারবে না! পারবে। পারবে! নিশ্চয়ই পারবে। তবে, হাতের কাছে যখন কামরূপ কামাখ্যা রয়েছে সেখানেই আগে ঢুঁ মারা যাক।

নির্মল গিয়ে পৌঁছল কামরূপ কামাখ্যায়। এটা নাকি তন্ত্র সাধনার সাধনপীঠ। অনেক বড়ো বড়ো সাধুরা এখান থেকেই সিদ্ধ হয়েছেন। যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের কাউকে কী সে পাবে না! নিশ্চয়ই পাবে।

পেল শেষ পর্যন্ত। তিনি নাকি ত্রিকালদর্শী। সব দেখতে পান। ইহকাল পরকাল, সব। এমন কোনো প্রশ্ন নেই, যার উত্তর তাঁর অজানা। নির্মল তাঁর চরণে গিয়ে পড়ল। তিনি তখন চোখ বুজে ধ্যানে মগ্ন। তাঁর সামনে কতগুলো ফলমূল, বাতাসা, মঠ, সন্দেশ। ফলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। গন্ধ বেরোচ্ছে। মঠ আর বাতাসাগুলো খেয়ে খেয়ে পিঁপড়েরা ফোঁপরা করে দিয়েছে। গিজগিজ করছে পিঁপড়ে।

নির্মল হঠাৎ দেখল, পিঁপড়েগুলো হুড়োহুড়ি করছে। তার উপস্থিতি টের পেয়ে কি ওরা চলে যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে ওরা! দেখতে গিয়ে দেখে, পিঁপড়েগুলো সার বেঁধে ওই ত্রিকালদর্শীর পা বেয়ে, এক চিলতে পোশাক পেরিয়ে, গা বেয়ে উঠে, ঠোঁটের ভিতর দিয়ে নাকের ভিতর দিয়ে কানের ভিতর দিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে! সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুনতে পেল, কে যেন তাকে বলছেন— বাবা এখন ধ্যানে বসেছেন...

কে বললেন কথাটা! ডান দিকে ঘাড় ঘোরাতেই নির্মল দেখল, পাশেই একজন সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল, বাবা কখন উঠবেন?

উনি বললেন, কয়েক মিনিট হতে পারে, কয়েক সপ্তাহ হতে পারে, কয়েক মাসও হতে পারে। আবার কয়েক বছরও হতে পারে। এমনকী কয়েক যুগ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই...

— সে কী!

— হ্যাঁ, বাবা যখন ধ্যানে বসেন, কখন উঠবেন কেউ বলতে পারে না।

— কিন্তু আমি যে অনেক দূর থেকে এসেছি...

— কী ব্যাপার বলুন।

— না, মানে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

— আমাদেরও প্রচুর প্রশ্ন থাকে। উনি ধ্যানে থাকলে ওনার সামনে বসে মনে মনে সেই প্রশ্ন করি। উত্তরও পেয়ে যাই।

— তাই!

— হ্যাঁ। আপনি করে দেখুন। আপনিও আপনার সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

— সত্যি?

— পৃথিবীর কিছুই সত্য নয়। সবই অনিত্য। করেই দেখুন না... বলেই উনি হাঁটা দিলেন। নির্মল ওঁর কথা মতো সেই ত্রিকালদর্শীর সামনে আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মনে মনে জানতে চাইল— কী করে অমর হওয়া যায় বাবা?

সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে আবার একই প্রশ্ন করল সে— বলো না বাবা, কী করে অমর হওয়া যায়?

টুঁ শব্দটি নেই। অনেকক্ষণ কেটে গেল। ফের মনে মনে বলল সে— বলো বাবা, কী করে অমর হওয়া যায়?

কোনো উত্তর নেই। হাঁটু টনটন করছে। হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে,

ধক্ ধক্ ধক্...

উনি যে বললেন, ওনার সামনে বলে মনে মনে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যায়। কই, কোনো উত্তর তো পেলাম না। তাহলে কী উনি এমনি এমনি বললেন। মিথ্যে মিথ্যে। অবশ্য উনি বলেছেন, উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে পাওয়া যায়, ওটা কিন্তু একবারও বলেননি। তবে কী পরে পাবো! দেখা যাক। না হলে তো হিমালয় আছেই। এর পরেই গো টু হিমালয়।

ফেরার জন্য ট্রেনে উঠে বসল নির্মল। ট্রেন চলছে। তার সিট পড়েছে মাঝের বাঙ্কে। সে বুঝতে পারছে, এই খোপে সেই কেবল আলাদা। বাকিরা সব একই পরিবারের। এমনকী ওদিকের জানালার মুখোমুখি দুটো সিটের, একটায় বসে যে বাচ্চা ছেলেটা বই পড়ছে, আর তার সামনেরটায় হেলান দিয়ে বসে যে মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি চোখ বন্ধ করে ঢুলছেন, তাঁরাও এদেরই সঙ্গে। দিনের বেলা, তাই সিট নামানো হয়নি। নীচের সিটের একধারে বসে আছে সে। জানালার দিকে চোখ।

— অমর, কমলালেবু খাবি?

'অমর' শব্দটা শুনেই ফিরে তাকাল নির্মল। দেখল, সামনের সিটের ভদ্রমহিলার কোলের উপরে কতগুলো কমলালেবু। উনি একটু ঝুঁকে ওইদিকের জানালার সিটে বই পড়তে থাকা বাচ্চা ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে আবার একই কথা বললেন। ছেলেটি এতই মগ্ন হয়ে বই পড়ছিল যে, প্রথমবারটা শুনতেই পায়নি। এবার শুনতে পেল। বলল, দাও। বলেই, বইটা বন্ধ করে, সিটের উপরে রেখে এগিয়ে এল সে। কাছে আসতেই ভদ্রমহিলা তার হাতে দুটো কমলালেবু দিলেন। আড়চোখে নির্মলকে দেখিয়ে বললেন, আঙ্কেলকে একটা দাও।

নির্মল বলল, না, না, থাক।

— থাক কেন? খান না। ভদ্রমহিলা বলতেই ছেলেটার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে একটা কমলালেবু নিল নির্মল। মৃদু স্বরে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম অমর?

— হ্যাঁ।

— কোথায় থাকো?

— কলকাতায়।

— কোন ক্লাসে পড়ো?

— সেভেনে।

— কোন স্কুলে?

— নব নালন্দায়।

— একটু আগে দেখছিলাম, তুমি একটা বই পড়ছিলে, স্কুলের বই?

— না, না। গল্পের বই।

— ও, আচ্ছা। আচ্ছা, তোমার নাম

তো অমর, তুমি কী জানো, কী করে অমর হওয়া যায়?

— হ্যাঁ। মাথা কাত করল ছেলেটা।

— জানো? বেশ মজা পেল নির্মল। যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সে হিল্লি-দিল্লি চষে বেড়াচ্ছে। কেউ বলতে পারছে না। সাধু সন্তরা পর্যন্ত ফেল পড়ে যাচ্ছে। আর এইটুকুন একটা ছেলে, সে বলে কিনা সে জানে কী করে অমর হওয়া যায়।

নির্মল তাকে বলল, বলো তো কী করে?

— কাজের মাধ্যমে।

— কাজের মাধ্যমে?

— হ্যাঁ। ওই যে বইটা পড়ছিলাম না... সেখানেও তো রয়েছে, নৌকো ডোবার পরে সবাইকে একে একে বাঁচিয়ে শেষে এই গল্পের নায়ক জলের তোড়ে নিজেই তলিয়ে গেল জলে। নিজের জীবন দিয়ে সে অমর হয়ে রইল।

— জীবন দিয়ে অমর!

— না, না। জীবন দিয়ে না। নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে লোকেদের বাঁচিয়ে তাঁদের মধ্যেই সে বেঁচে রইল। ভালো কাজ করলে সেই কাজের মধ্যে দিয়েই লোক বেঁচে থাকে। জানেন না? যেমন শাজাহান। শাজাহান তো এখন নেই। কিন্তু তাজমহল গড়ার জন্য তিনি কিন্তু অমর হয়ে আছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়েই অমর হয়ে আছেন। যেমন রামকৃষ্ণ, তিনি সবার ঘরে ঘরে আছেন। সবার মনে মনে আছেন। এটাই তো অমর হওয়া...

— এটা অমর হওয়া!

— হ্যাঁ। মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু বেঁচে থাকতেই পারে। তার কাজের জন্য। কাজই মানুষকে অমর করে রাখে।

কাজ! এই জন্যই কী তারাপীঠের ওই সন্ন্যাসী তাকে বলেছিলেন, কাজ কর, কাজ কর! কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে! অমর হয়ে যায়! কামরূপ কামাখ্যার ওই সাধু তাকে ঠিকই বলেছিলেন, ওনার সামনে বসে মনে মনে প্রশ্ন করে দেখুন, ঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। ও পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও, পেয়েছে। ওর আর হিমালয়ে যাবার দরকার নেই।

এখন ওকে কাজ করতে হবে। সত্যিকারের কাজ। যে কাজের মধ্যে দিয়ে ও অমর হয়ে উঠবে। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে সবার মনে, সবার হৃদয়ে। কিন্তু কী করবে সে! কী! ভাবতে ভাবতে জানালার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে তাকাল সে। চোখের সামনে থেকে সরে সরে যাচ্ছে, গাছ বাড়ি মাঠ গরু ছাগল ল্যাম্পপোস্ট... কিন্তু ওর চোখে কিছুই পড়ছে না। ও শুধু তাকিয়ে আছে। তাকিয়েই আছে! কী করা যায়! কী করা যায়! কী! ■

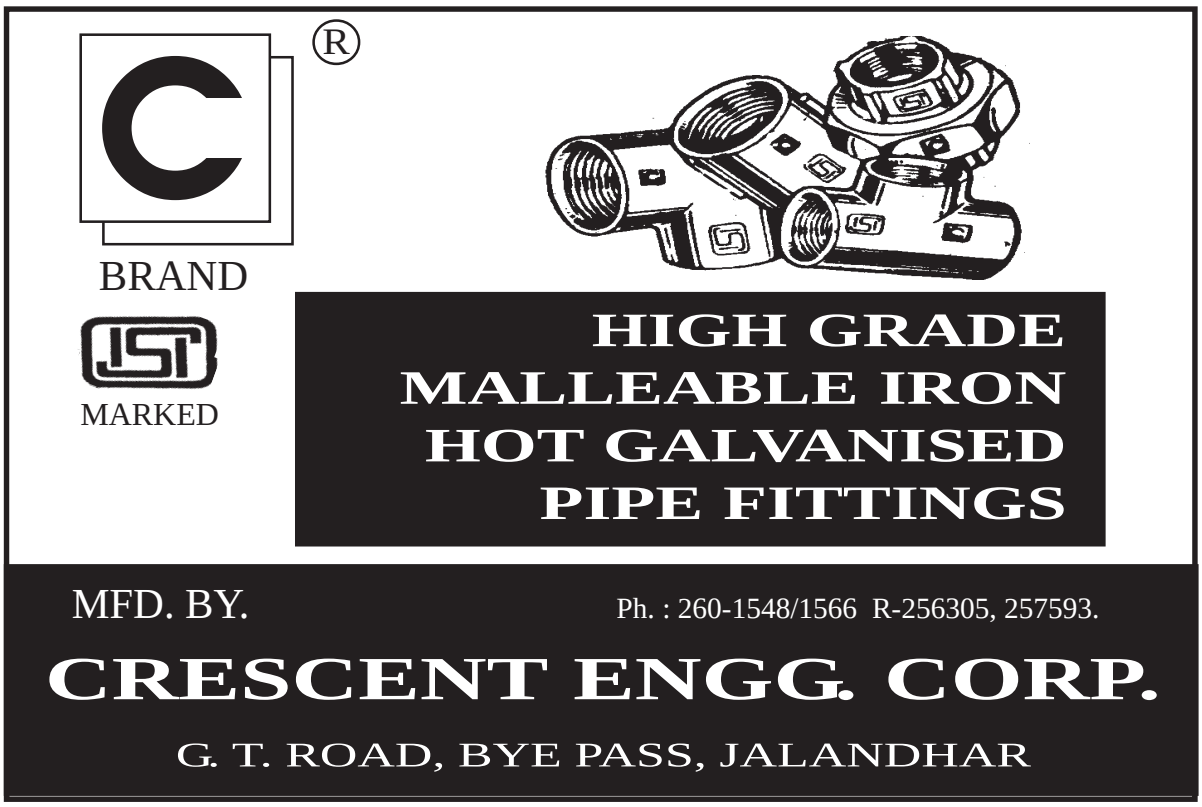

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কন শিরোমিতিবিদ্যার প্রয়োগ ও প্রভাব

অর্ণব নাগ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিলেত থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র 'ভাই জ্যোতিদাদা' সম্বোধনে এক পত্রে লেখেন:

''আপনার ছবির খাতা আমি Rothenstein-কে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয়নি, এর মতো এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent — এই তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত art critic কে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolio-র আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত।... যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিস এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এ ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করেছেন। রোটেনস্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে, আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথমশ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত, এ কথাটা চাপা রাখলে চলবে না''।[১]

নাহ! কথাটা শেষ পর্যন্ত মোটেও চাপা থাকেনি। চিত্রগুণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমাদর সমকাল ও উত্তরকালে হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন আমাদের ভাবাবে যে উইলিয়ম রঁদেনস্টাইনের মতো সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও চিত্রসমালোচক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকার মধ্যে এমন কী দেখেছিলেন যা তাঁকে এতটা উচ্ছ্বসিত করেছিল? তার আগে বলা দরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কনের বিষয়টি, যেটি ছিল মানব-মুখের প্রতিকৃতি। কবির কাছেই বিলেতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন দেখেন রঁদেনস্টাইন। তাঁর কাছেই শুধু এনিয়ে নিজের বিস্ময় বিমুগ্ধতা প্রকাশ করে থেমে থাকেননি তিনি, ১৯১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হ্যাম্পস্টেড থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা এক পত্রে রঁদেনস্টাইন তাঁর রেখাঙ্কনের সংবেদনশীলতা ও চরিত্রায়নের তাৎপর্যতার সপ্রশংস উল্লেখ করেন:

I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it whold be difficult to match[২]।

এরই ফলশ্রুতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা প্রতিকৃতির একটি অ্যালবামের প্রকাশ ঘটল কলকাতায় নয় অবশ্য; খোদ বিলেতে।[৩] এহেন অ্যালবামের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখলেন রঁদেনস্টাইন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের বঙ্গানুবাদের সাহায্য নিয়ে সেই ভূমিকার একটি বিশেষ অংশ আমাদের দেখে নেওয়া দরকার:

> নিজের অনুরাগ বশতঃ ও আনন্দলাভার্থ তিনি বহুদিন হইতে আত্মীয় ও বন্ধুগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন, এবং সখের চিত্রকরগণের নিকট আমরা যে একাগ্রতা ও যথার্থতা আশা করিয়া থাকি অথচ প্রায়ই দেখিতে পাই না, সেই গুণগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কিত মুখগুলিতে এমন একটি আকৃতির সচেতনভাব আছে যাহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।[৪]

সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই আবার ফেরা যাক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রতিকৃতির রেখায় কীসের সন্ধান পেয়েছিলেন রঁদেনস্টাইন, যা তাঁকে আপ্লুত করেছিল এবং স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেই বলি, রঁদেনস্টাইন সেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রগুলি প্রকাশের উদ্যোগ না নিলে, চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতটা সমাদৃত হতেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আমাদের গভীর কৌতুহলের সেই প্রশ্নটির উত্তর হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখায় ফুটে উঠেছিল ফ্রেনোলজি বা শিরোমিতিবিদ্যার প্রয়োগ, রঁদেনস্টাইন যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন

সংবেদনশীলতা।

আধুনিককালে শিরোমিতিবিদ্যা (Phrenology)-কে বিজ্ঞানীরা ছদ্মবিজ্ঞান বা সিউডো-সায়েন্স বলে মনে করেন।[৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল শিরোমিতিবিদ্যা হলো 'মস্তিষ্কতত্ত্বের ওপর স্থাপিত এক প্রকার মনোবিজ্ঞান-তন্ত্র বিশেষ'[৬] মোট কথা মস্তিষ্কের গঠন-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে মানব প্রকৃতির অনুধাবন-ই হলো শিরোমিতিবিদ্যার মূল কথা। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন তিনি যে শিরোমিতিবিদ্যা-চর্চার উদ্যোগ করেছেন তা তখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই বিশিষ্ট দার্শনিক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন: 'আচ্ছা, ফ্রেনলজিতে তোমার কী খুব বিশ্বাস? ফ্রেনলজির সব কথাই কি ঠিক?' তখন অকপটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন : 'আমি ফ্রেনলজিস্টদের সব কথা বিশ্বাস করি নে,— তবে মোটামুটি কতকটা মেলে— এই মাত্র।'[৭]

লালন ফকিরের স্কেচ : শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

তবে পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও শিরোমিতিবিদ্যা নিয়ে তাঁর চর্চার অন্ত ছিল না। সাময়িক-পত্রে এ সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি, যেগুলি পরে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'প্রবন্ধ মঞ্জরী'তে সংকলিত হয়েছে। যাই হোক, বিভিন্ন মানুষের প্রতিকৃতি নির্মাণের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর শিরোমিতি বিদ্যাচর্চার ফলিত প্রয়োগ করেছিলেন, যে কারণে রঁদেনস্টাইনের বিবৃতি অনুযায়ী চিত্র রেখাঙ্কনের সংবেদনশীলতা আমরা দেখতে পাই। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'র অনুলেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য :

> দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'ভারতী'র সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য 'বালক' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তখন জ্যোতিবাবু physiognomy (মুখসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'বালকে' প্রতিকৃতিসহ শিরসামুদ্রিক অনুসারে স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি মহাত্মাগণের চরিত্র-সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ও রাজনারায়ণবাবুর ছবি জ্যোতিবাবুর স্বহস্তাঙ্কিত পেন্‌সিল স্কেচ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।[৮]

১২৯২ বঙ্গাব্দে বালক পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে 'মুখ চেনা' প্রবন্ধটি তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বাঙ্গলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার রাজনারায়ণ বসুর মস্তিষ্কের গঠনতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করেন তিনি। যেমন 'উভয়ের উৎকৃষ্ট কপাল'-এর মধ্যে 'রাজনারায়ণবাবুর উপরিভাগের কপাল নিম্নভাগের কপাল অপেক্ষা বেশি ভরাট। এই জন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের দিকে রাজনারায়ণবাবুর বেশি ঝোঁক'। অন্যদিকে 'বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি, সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু— ইহাতে ছোট খাট জিনিস খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়।' এরকমভাবেই মস্তিষ্কের গঠনতত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম ও রাজনারায়ণের মানসিক প্রবণতা, সেই অনুসারী কর্ম ও লেখনী-প্রতিভার বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[৯]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম জীবনীকার সুশীল রায় রবীন্দ্রভারতী চিত্রশালায় সংরক্ষিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের যে কালানুক্রমিক তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় ১৮৭০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত অজস্র প্রতিকৃতি এঁকেছেন তিনি। এই সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় অন্তত হাজার দুয়েক প্রতিকৃতির রেখাঙ্কন করেছেন তিনি, তুলি-রং বা কালি-কলমের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পেনসিলের সাহায্যে। তাঁর এই ধরনের আঁকা প্রতিকৃতিতে যে শিরোমিতিবিদ্যার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে তা বোঝা যায় এই পেনসিল-স্কেচের সৌজন্যেই। কারণ, তুলি-রঙ বা কালি-কলমের চেয়ে একমাত্র পেনসিলের মাধ্যমেই মস্তিষ্কের রেখাগুলিকে ব্যাপকতর স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিটি চিত্ররেখাঙ্কনই বিশেষত্বের দাবি রাখে।

সমকালীন সুবিখ্যাত মনীষী থেকে নগণ্য ব্যক্তি, সকলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির খাতায় সমাদরে ঠাঁই পেয়েছেন। মন্মথনাথ ঘোষের ভাষায়:

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রীতিমত পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তির মুখের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার খাতায় অসংখ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। রাজা মহারাজা হইতে পাখাটানা কুলীও তাঁহার খাতায় সসম্মানে স্থান পাইয়াছে। এই চিত্রগুলির একটু বিশেষত্ব আছে।[১০]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'র সুবাদে আমাদের জানা আছে যে, হিন্দু স্কুলে পড়বার সময় বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা, এদেশের অন্যতম প্রথম ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মণিরামপুরে

জনৈক চীনা রাজমিস্ত্রি : শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহের কাকা প্রতাপনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে গিয়ে নেহাত ছেলেমানুষী খেয়ালবশে এঁকে ফেলেন প্রতাপনারায়ণের একটি পেনসিল স্কেচ এবং তা তৎক্ষণাৎ প্রশংসাও লাভ করে। ফলে উৎসাহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সুবিশাল যৌথ পরিবারের নানা জনের মুখচিত্র ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সে সবই বাতিল খসড়া কাজের কাগজে; তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বালক বয়সের আঁকা ছবিগুলি কোনোভাবেই সংরক্ষণ করা যায়নি।

তবে এরই মধ্যে সবচেয়ে কৌতুকোদ্দীপক ঘটনা হল, হিন্দু স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়বার সময় ক্লাসে বসেই শিক্ষক জয়গোপাল শেঠের প্রতিকৃতি আঁকা। যে মাস্টারমশাই দেখতে মোটেও সুশ্রী ছিলেন না, বরং কিছুটা কিম্ভুতকিমাকারই ছিলেন। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতটাই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন জয়গোপাল শেঠের চিত্র, যে শিক্ষকরাও বিষয়টিতে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করেছিলেন। সুতরাং প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের প্রতিভা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবাল্য, আকৈশোর। পরবর্তী সময়ে শিরোমিতিবিদ্যার প্রভাব তাঁর আঁকা মুখ-প্রতিকৃতিগুলিকে বিশেষত্ব দিয়েছিল, সর্বগুণান্বিত করেছিল। তবে প্রথাগত চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় শিক্ষা তাঁর হয়নি, এনিয়ে মনে তাঁর খেদ ছিলই। ছোটবেলায় বাতিল কাগজে আঁকা ছবিগুলি চিরতরে হারানোর মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতিটি না পাওয়ার বেদনা তাঁর মনে বহুদিন ছিল।[১১] আর আফশোস ছিল সমকালে দেখা বহু মানুষের প্রতিকৃতি তাঁর ছবির খাতায় ধরা থাকলেও বাদ পড়ে গিয়েছেন বাংলার বাঘ-খ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর আঁকার খাতাগুলি জীবনসায়াহ্নে দিয়ে যান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িরই আরেক কৃতী সন্তান তথা সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সেই সূত্রে অবন ঠাকুর করেছিলেন চিত্রকর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনবদ্য মূল্যায়ণ, স্মৃতিচারণাও বটে :

> ''কয়েক বছরের কথা— রাঁচীতে আর একবার তাঁর কাছ পেয়েছিলাম— তাঁর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) প্রথম প্রশ্ন হল— তোমার ছবির কাজ কেমন চলছে। তারপর নিজের আঁকা ছবির খাতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, দেখ। এই ছবির সমস্ত খাতা মৃত্যুকালে আমাদের তিনি দিয়ে গেছেন, নতুন 'কাকামশায়ের শেষদান'— এই কথাটি লিখে। এই ছবির খাতায় জানা-অজানা ছোট বড় আত্মীয় পর কারু ছবি তুলে রাখতে তিনি ভোলেননি। তিনি দুঃখ করে বলতেন— আমার ছবির খাতায় সবাই ধরা পড়েছেন— কেবল একমাত্র আশু মুখুয্যে মশায়কে আমি ধরেও ছেড়ে দিয়েইলি— এই বড় আফ্‌শোষ হয়। এই ছবির খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হল কই আমরাও তো ছবি আঁকি। কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভদ্র সুন্দর অসুন্দর নির্ব্বিচারে এমন করে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমরা মুখ বাছি! কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে সব মুখ তাঁর চোখে সুন্দর হয়ে উঠলো, কি চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে সুন্দর ঠেকলো কোন মুখ অসুন্দর রইলো না। রূপ বিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না।''[১২]

তাঁর রেখার বিশেষ ভাবটির পেছনে যে কোনো নির্দিষ্ট বীক্ষা রয়েছে তা বোঝা যায় তাঁর এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি পড়লে। তাঁর দুটি প্রবন্ধের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া 'মনোবৃত্তির সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ', 'আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও

ফ্রেনলজি', 'লোক চেনা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতেও[১৩] রেখা-চর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিরোমিতিবিদ্যার বীক্ষণের সুস্পষ্টতর প্রভাব অবশ্যই চোখে পড়ে। 'মানসী' পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা বীরবল-খ্যাত প্রমথ চৌধুরীর 'পেনসিল স্কেচ'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে 'জনৈক শিল্পসেবী' অনন্যসাধারণ লেখনীতে 'রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'-এর রেখাঙ্কনে ফ্রেনোলজি-চর্চার কথাই সাড়ম্বরে উল্লেখ করেছিলেন। সেই অনুপম ভাষ্য :

> ''শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রেখাঙ্কনশিল্পী। তাঁহার রেখায় প্রাণ আছে। সে প্রাণ তাঁহার রেখাঙ্কিত বিষয়সম্ভূত নহে। রেখারই সরু মোটা লম্বা সোজা দাগের মধ্যে। সে দাগের প্রত্যেক অংশের তাৎপর্য আছে, প্রয়োগের দিক আছে, স্থিতি এবং ব্যপ্তি আছে— সে দাগের আরও শক্তি আছে— যা মনোযোগ আকর্ষণ করে, — কেবলমাত্র সে রেখার প্রতি নহে; রেখার মধ্যে যে সীমাহীনতা আছে, তাহারও প্রতি।
>
> ক'দিন পূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মস্তিষ্কতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রেই মানবমুখের এই রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান লেখক যখন বালক ছিল তখন 'বালকে' প্রকাশিত 'মুখচেনা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছবির আশায় মাসান্তে বহুবার ডাক-দপ্তরে আনাগোনা করিত। যাঁহারা সে সকল প্রবন্ধ এবং ছবি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি সামান্য রেখা দ্বারা কি অসামান্য ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। 'বালকে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রখানিতে তাঁহার ভ্রু, অক্ষিপল্লব ও তারকা কেবলমাত্র কয়েকটি রেখার সমষ্টি কিন্তু ঐ রেখা কয়টি সেই মহামনস্বী পুরুষের কি অলোকসামান্য শ্রদ্ধা রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।''[১৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ধরনের রেখাঙ্কনের ফলে আমাদের উপরি লাভ এমন কিছু সমকালীন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের চিত্র, যা তিনি না আঁকলে আর আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হতো না। প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক প্রশান্ত কুমার পাল এমন তিনজনের কথা উল্লেখ করেছেন— যেমন, লালন ফকির, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, ব্যবহারজীবী নরসিংহ দত্ত।[১৫] আমরা এই তালিকায় হিন্দুমেলা খ্যাত নবগোপাল মিত্রের নামও সংযুক্ত করতে পারি। যোগেশচন্দ্র বাগল বহু পরে তাঁর 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' বইতে নবগোপালের বংশধরদের থেকে প্রাপ্ত একটি ছবি দিয়েছেন। নবগোপাল মিত্রের এখনও পর্যন্ত একমাত্র এটিই লভ্য ছবি। যদিও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালায় ১৮৭৩ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখায় ফুটে ওঠা নবগোপালের একটি চিত্র রয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত অব্যবহৃত। ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাচিত্রে সমকালও প্রতিবিম্বিত হয়। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র সম্পাদনায় প্রশান্ত পাল উল্লেখ করেছেন :

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূল স্কেচগুলি দেখলে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে অনেকগুলির মাথার অংশ অজস্র রেখায় বিভক্ত। বোঝা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিরোমিতি বিদ্যার প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে স্কেচগুলিকে ব্যবহৃত করেছেন।[১৬]

অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীকার সুশীল কুমার দে-র মন্তব্য : ''জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা হচ্ছে রূপবিদ্যার সাধনা। সব জিনিসের মধ্যেই তিনি সুন্দরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এই জন্য তিনি মুখ বাছেননি — রাজা-মহারাজা থেকে আরম্ভ করে একজন সামান্য পাঙ্খাপুলারের চিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন।[১৭]

পরিশেষে এটাই বলার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুবাদ কর্মে, সাহিত্য-সৃষ্টি, নাটক-রচনার মতো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যেমন সমকালেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, রদেঁনস্টাইনের চোখে পড়ার আগে তাঁর চিত্রশৈলী ততটা প্রচারের সুযোগ পায়নি। পরে অবশ্য এই খেদ পুষিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আমরা পেয়েছি মূলত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর 'পেনসিল-স্কেচ' প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে। কিন্তু এর পেছনে শিরোমিতিচর্চার প্রয়োগের যে উপযোগিতা রয়েছে তাও অবিস্মরণীয় ও স্মর্তব্যও বটে।

উল্লেখপঞ্জি:

১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্মথনাথ ঘোষ। কলকাতা, ১৯২৭। পৃঃ ১৩৯। ২) তদেব, পৃঃ ১৪০। ৩) বইটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ:

Twenty-five Collotypes
from the Original Drawings by
Jyotirindra Nath Tagore
Hammersmith
Made & Printed by
Emery Walker Limited
1914

৪) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ১৪৩। ৫) Pseudoscience and the Paranormal : T. Hines. New York, America. pp.200. ৬) প্রবন্ধ মঞ্জরী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতা, ১৯০৫ খ্রি.। পৃঃ ৫৩৭। প্রবন্ধের শিরোনাম 'শিরোমিতি-বিদ্যা'। ৭) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি : সম্পাদনা প্রশান্তকুমার পাল। সুবর্ণরেখা, ২০০০। পৃঃ৫৮। ৮) তদেব। ৯) প্রবন্ধ-মঞ্জরী, পৃঃ ৪৬২-৪৬৩। প্রবন্ধ-শিরোনাম : মুখচেনা। ১০) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ১৩৮। ১১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। পৃঃ ১৫-১৬। ১২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩২। পৃঃ ৫৭৬। ১৩) প্রবন্ধগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-মঞ্জরী (কলকাতা, ১৯০৫) গ্রন্থে সংকলিত। ১৪) রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : জনৈক শিল্পসেবী। মানসী, বৈশাখ, ১৩২০। পৃঃ ২১৩-১৪। ১৫) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। প্রশান্তকুমার পাল প্রদত্ত টীকা। পৃঃ ১২৬। ১৬) তদেব, পৃঃ ১২৬। ১৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : সুশীল রায়। জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৩। পৃঃ ১৯১-১৯২।

বঙ্কিমচন্দ্র

রমেশচন্দ্র দত্ত

জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ও দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক

সুদীপ বসু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের দার্শনিক পিতা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহাঋত্বিক। কয়েকটি বিষয়ে তিনি এখনও পর্যন্ত প্রথম অথবা প্রধান। তিনি বাঙ্গলার প্রথম ঔপন্যাসিক এবং অনেকের মতে প্রধান ঐতিহাসিক। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর লেখক হিসাবে সংগঠিত ধর্ম ও দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার 'কৃষ্ণচরিত্র'এর মধ্যে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানের যে সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে, তার তুল্য পাওয়া যাবে না। সাম্যবাদী চিন্তাও তিনি বাঙ্গলায় বৃহৎ আকারে এনেছেন। পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে এখনও তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতে হয়। আর স্বাধীনতা আন্দোলনকালে তাঁর সাহিত্য ও সংগীত বাঙ্গলা ও ভারতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সমান কৃতিত্ব অন্য কোনো সাহিত্যিক দাবি করতে পারেন না।

স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতার আগে বাঙ্গলা ও ভারতে প্রচুর প্রশস্তি পেয়েছেন। তুলনায় নিন্দার পরিমাণ কমই। স্বাধীনতার পরের চিত্র বিপরীত। প্রশস্তি কমেছে যথেষ্ট পরিমাণে। কারণ আমাদের এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হচ্ছে না। আর প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে নিন্দা। শোনা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে কিছুই নন। তিনি কেবল গালগল্পের রোম্যান্স লিখে অপরিণত মনের পাঠক ভুলিয়েছেন। তিনি সংকীর্ণ হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী। তিনি প্রগতির ঢেউ আটকানো মূঢ় ঐরাবত ইত্যাদি। সত্যিই কি তিনি তাই? অতি বিশ্লেষণের অতিকথনে ঘুরপাক না খেয়ে কেউ যদি অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও মর্মভেদী কল্পনার শক্তিতে মানবজীবনের দারুণ বাসনা ও প্রদাহ, মানবভাগ্যের উত্থান-পতনের রহস্য উন্মোচন করেন— তিনি কি নিছক রোমান্সের লেখক হয়ে যাবেন? ছোট বাঙালি আঁকলেই বড়ো লেখক আর বড়ো বাঙালি বা ভারতীয় আঁকলে ছোট লেখক? কিংবা অত্যাচারী হিন্দু বা ইংরেজ শাসকের ছবি আঁকলেই কেউ সত্যবাদী? আর অত্যাচারী মুসলমানের ছবি আঁকলেই তিনি সাম্প্রদায়িক? এই ব্যাখ্যা খুবই সুবিধাজনক রাজনৈতিক সরলীকরণ নয় কি? হিন্দু পুনরুত্থানবাদী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কোন ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলেন তা কি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে? পুরনো যুগের গৌরবগাথা স্মরণ করালে কিংবা সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে গ্রহণ করতে বললেই তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হবে কেন? যদি কেউ নিজের ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা বলেন, তাহলে তিনিও কি প্রতিক্রিয়াশীল?

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন মোটামুটি ত্রিশ বছরের। এই কালব্যাপ্তি অবশ্যই বেশি নয়। কিন্তু তাঁর মানসবিবর্তনের ধারাপথ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রশ্ন এটাই— মৌলিক সাহিত্যচর্চার পথ ত্যাগ করে তিনি মননশীল প্রবন্ধ রচনা কেন শুরু করলেন? কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ মনকে উপন্যাসের মধ্যে মেলে ধরতে পারেননি। সেটা সম্ভবও ছিল না। কেননা দেশ ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাঁকে অবিরাম পীড়িত করত। ফলে বঙ্কিম-প্রতিভা উপন্যাসের উপল উপকূল ত্যাগ করে নেমে এসেছে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের জগতে। হাহাকার করে উঠেছে বাঙ্গালির কেন ইতিহাস নেই, এই বেদনায়। অনুভব করেছে জাতীয় জীবনের পূনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক সত্তার সঙ্গে মিলে গেছে তাঁর শেষ পর্বের ঔপন্যাসিক সত্তা। এই মিলনস্থলে নির্মিত হয়েছে তাঁর জাতীয়তাবোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে তাঁর দীর্ঘকালের বৌদ্ধিক অনুশীলনের ফলে। এর দুটি অভিমুখ আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জাতীয় জীবনের আদর্শ পুরুষরূপে উপস্থাপনার প্রয়াস। দ্বিতীয়ত, হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের পরিবর্তে মহাভারতের কৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র নির্বাচন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, কৃষ্ণের জীবন ও কর্ম চারটি বৃত্তির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনে নির্মিত (শারীরিক, কার্যকারিণী, জ্ঞানার্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী)। এই চার বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলন না হলে পূর্ণ মানব হওয়া সম্ভব নয়। সন্ন্যাসজীবনে যেহেতু চার বৃত্তির পুরো অনুশীলন সম্ভব নয়, তাই বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে এই অপূর্ণ অনুশীলনের উল্লেখ পাই, যার ফলে মানবজীবন ধ্বংস হয়ে গেছে (যেমন, 'চন্দ্রশেখর' কিংবা 'কপালকুণ্ডলা')।

অন্যদিকে এই চার বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সামনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতো সুমহান চরিত্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠবে আগামী ভারতবর্ষ— হয়তো এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল। তবে যেহেতু তাঁর সামনে বাঙ্গালি পাঠক উপস্থিত, তাই বাঙ্গলাদেশের পতনের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর বিপরীত প্রেক্ষায় আছে দেশের অভ্যুদয়ের কাহিনি। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' উপন্যাসে তাঁর এই প্রয়াস স্পষ্টই ধরা পড়ে। সেইসঙ্গে 'ভারতকলঙ্ক— ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' ইত্যাদি প্রবন্ধের কথাও বলতে হয়।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার সেকথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন— 'অর্ধশতাব্দীর অধিককাল হইল বঙ্কিমচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন। তিনি যে শুধু বন্দেমাতরম্ সংগীতই রচনা করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি আমাদের জাতীয় জীবন পরিচালনার পথও দেখাইয়াছেন। তিনি আমাদের সংহত, শিক্ষিত এবং বলশালী হওয়ার জন্য বলিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, যে জাতি দুর্বল সে কখনো স্বাধীনতা পাইতে পারে না এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও পারে না।'[১]

কিন্তু আগেই বলেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রবোধ সহসা জাগ্রত ব্যাপার নয়। তা বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ফল। বিষয়টি এইভাবে যদুনাথ সরকার ব্যাখ্যা করেন—

> 'বঙ্কিমের প্রতিভার ক্রমবিকাশের ফলে তাঁহার শেষ উপন্যাসগুলিতে যে অমৃতরস পাই, দুর্গেশনন্দিনীতে তাহা পাই না; এই অমৃতরসের উৎস তাঁহার হৃদয়ে। ইহা ভগবদগীতার দান; স্বদেশ-প্রেম ও ধর্ম্মে মতি এই উভয়ের অপূর্ব মিলন সংঘটন করিয়া, তাঁহার প্রতিভায় ও তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন মিশ্র পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার গভীর ও বিস্তৃত ইংরাজী শিক্ষার উপর ভগবদগীতার প্রভাবের এই ফল। এই জন্য আমরা তাঁহার পরিপক্ক বয়সের উপন্যাসগুলিতে পাই এমন একটি উপকরণ যাহা তাঁহার যৌবনের গল্পগুলিতে নাই। সেটিকে আদর্শবাদ না বলিয়া উর্ধপ্রবাহিনী ভাবধারা বলিলে সহজ হইবে, অর্থাৎ ইংরাজী কথায়

idealizing element। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ' খুব সুন্দর গল্প, কিন্তু গল্পমাত্র। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' গল্প বটে, কিন্তু উপন্যাসের অধিক, এগুলি গল্পের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে অদৃশ্যে নিঃশব্দে পাঠকের চিত্তকে দেবলোকে লইয়া যায়, এই মহাকাব্যগুলি সত্য সত্যই প্রমাণ করে যে স্বর্গে ও মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে।' বঙ্গমাতার অপার করুণায় তাঁহার অন্য অনেক বরপুত্র অমর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিতে এরূপ কল্পনার মন্দাকিনীপ্রবাহ নাই, তাঁহারা 'ত্রিস্রোতসং বহতি ন গগনং প্রতিষ্ঠাং'। কিন্তু বঙ্কিমের শেষ বয়সের উপন্যাসগুলি এই অলৌকিক কার্য্য, এই সাহিত্যিক যাদুগরী করে।

সপরিবারে যদুনাথ সরকার

> ... মনোরম গল্পের ভিতর দিয়া, আমাদের পরিচিত সংসারের কাহিনীর ছবির ভিতর দিয়া, দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটা অপরিচিত লোকে, একটা চরমপ্রায় অমানুষিক নৈতিক আদর্শে যে পৌঁছান যায় এবং সেই কাল্পনিক দেবলোকে আমাদের চিত্তের চিরবসতি যে লাভ করিতে হইবে, এই সত্য বঙ্কিমের শেষ উপন্যাসগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সেই প্রয়াসে যে তিনি সফল হইয়াছেন, তাহার সাক্ষী লক্ষ লক্ষ পাঠকের হৃদয়। ... 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফে'র সৃষ্টিকর্ত্তা অন্তিমে একেবারে স্বদেশী হইয়া গিয়াছেন।[২]

অন্যদিকে রমেশচন্দ্র দত্তের মতো ঐতিহাসিকও বাংলায় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায় ... একদিকে যেমন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি তাহা হিন্দুদের পৃথক জাতীয়তা ভাবে ইন্ধন যোগাইতেছিল।' প্রসঙ্গত বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী উদ্ধার করে রমেশচন্দ্র বলেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' বিপিনচন্দ্রের মনে 'প্রথম দেশপ্রেম' জাগ্রত করে।

রমেশচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারতকলঙ্ক— ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' এই প্রবন্ধের উপর। রমেশচন্দ্রের বিবেচনায় এই প্রবন্ধে 'হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠা ও মঙ্গল সম্বন্ধে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা দেশে হিন্দুদের জাতীয়তাভাবের উদ্বোধনের মূল দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮৭২ সালে বা তাহার পূর্বে এই বিষয়ে আর কেহ এইভাবে চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।' রমেশচন্দ্র আলোচ্য প্রসঙ্গের ইতি টেনেছেন এইভাবে— বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনাগুলি 'বাঙ্গলায় জাতীয়তাভাবের এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল এবং যে জাতীয়তা শতকের প্রথমে বাংলার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা প্রসার (লাভ) করিয়া রাজপুতানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ লইয়া মহাদেশ ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল— ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'[৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে নির্মিত আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ। এবিষয়ে দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের ধারণা স্বচ্ছ ছিল। তাঁরা দেখতে চেয়েছেন, জাতীয়তাবাদ কোনো জাতির দীর্ঘকালীন জাতীয় সত্তার অনুশীলনের ফল। বঙ্কিম-প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতি সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

তথ্যসূত্র— ১। আনন্দবাজার, ৪ জুলাই ১৯৪৯, আকর— বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ, যদুনাথ সরকার, 'যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার' গ্রন্থভুক্ত', সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, এম সি সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৭৫৬।

২। বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশ, যদুনাথ সরকার, 'যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার' গ্রন্থভুক্ত', সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, এম সি সরকার অ্যান্ড প্রাইবেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৪।

৩। দেশাত্মবোধ ও রাজনীতিক আন্দোলন', দ্বিতীয় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)' গ্রন্থভুক্ত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৩, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা ৫৩৪-৫৩৮।

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED CO.

KOHINOOR INDIA PVT. LTD.

IS No. : 2414:2005

(A GOVERNMENT RECOGNISED ONE STAR EXPORT HOUSE)

Off. : +91-181-5230052, 5230057, 5230060, 5230075 Fax : +91-181- 5230014
Email : info@kohinooronline.com Website : www.kohinooronline.com

With Best Compliments from :-

R K Global

NSE | BSE | MCX | NCDEX | MCX SX | NSDL

R K Global

With Best Compliments from :-

Banwarilal Associates Pvt. Ltd.

B-17, Ashok Nagar
Ghaziabad
Uttar Pradesh
Pin - 201001

তৃতীয় পানিপথ

গোপাল চক্রবর্তী

শয়নকক্ষে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ জপধ্যান করা পেশোয়া বাজীরাওয়ের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সেদিনও জপধ্যান শেষে পেশোয়া শয়নকক্ষে যাবেন এমন সময় দ্বাররক্ষী অভিবাদন করে দাঁড়াল। পেশোয়া জিজ্ঞাসা করলেন—

— কিছু খবর আছে?

— সেনাপতি ইব্রাহিম কার্দি সাক্ষাৎপ্রার্থী

— মন্ত্রণাকক্ষে বসাও।

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

দ্বাররক্ষী আবার অভিবাদন করে চলে গেল। চিন্তার ভাঁজ পড়লো পেশোয়ার ললাটে। এতরাতে কার্দির আগমনের কারণ কী? মারাঠা সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে মুসলমান হলেও কার্দি পেশোয়ার বিশেষ বিশ্বাসভাজন। অবশ্য একদিনে কার্দি পেশোয়ার বিশ্বাসভাজন হননি। এর জন্য অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাকে। আফগান সৈনিক ইব্রাহিম কার্দি দিল্লির বাদশাহী ফৌজে কর্মরত ছিলেন। মোগল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পদচ্যুত হয়ে অনেক সতীর্থের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পথে পা বাড়ান। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগরের মতো মুসলমান রাজ্যগুলিতেও আশানুরূপ কাজ না পেয়ে কার্দি একাকী যাত্রা করলো হিন্দুরাজ্য মহারাষ্ট্রের দিকে। ততদিনে কার্দির সঙ্গী সাথীরা অনেকেই ছোট ছোট জায়গিরদারদের অধীনে কর্মরত হয়েছে। কেউ বা পেশা হিসাবে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছে। একদিন সশস্ত্র কার্দি একাকী চলেছেন এক নির্জন পাহাড়ি পথে পুণার উদ্দেশে। তার আগে যাচ্ছিল অশ্বশকটে এক ক্ষুদ্র তীর্থযাত্রীর দল। অদূরেই সেই দলটি আক্রান্ত হলো দস্যুদের দ্বারা, দলটির সঙ্গে যে ক'জন রক্ষী ছিল দস্যুরা ছিল তাদের তুলনায় বেশি। দস্যুরা সহজেই তাদের কাবু করে লুঠতরাজ আরম্ভ করে। তীর্থযাত্রীরা অভিজাত, দস্যুরা স্থানীয় উপজাতি। কার্দি আড়াল থেকে সব দেখেছিলেন। হঠাৎ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন দস্যুদের উপর। ক্ষিপ্র হস্তে অসি চালনা করে অল্প সময়ের মধ্যে দস্যুদের বিতাড়িত করেন। তীর্থযাত্রীদের যিনি দলপতি, তিনি এই বিদেশি যুবকের রণকৌশলে চমৎকৃত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন— তোমাকে দেখে বিদেশি বলে মনে হচ্ছে। তুমি কে? এখানে আগমনের হেতু কী?

কার্দি অকপটে তার পরিচয় এবং পুণা যাত্রার উদ্দেশ্য দলপতির কাছে ব্যক্ত করল। সব শুনে দলপতি বললেন— — আমিও পুণায় যাচ্ছি, পুণায় থাকি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। সম্ভব হলে পেশোয়ার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেব।

কার্দি পুণায় এলেন তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে। কার্দি তখনও জানেন না যাঁর সঙ্গে, যাঁর আহ্বানে পুণায় এসেছেন, তিনি স্বয়ং পেশোয়ার বালাজী বাজীরাও। মারাঠা সাম্রাজ্যে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও এক নতুন চিন্তাধারার নেতা ছিলেন। শিবাজী থেকে পিতা প্রথম বাজীরাও পর্যন্ত মারাঠা বাহিনীতে জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের যে আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছিল, তা তিনি পরিত্যাগ করেন। এত দিন মারাঠা সৈন্যবাহিনী ছিল সম্পূর্ণরূপে মারাঠাদের নিয়ে গঠিত। বালাজী বাজীরাও সামরিক শক্তি ও দক্ষতা বাড়াবার জন্য সেনাবাহিনীতে বহু বেতনভুক অ-মারাঠী সৈন্য ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন। নিজ গুণে কার্দিও মারাঠা সেনাবাহিনীতে প্রথমে দু'হাজার এবং পরে দশ হাজার সৈন্যের সেনাপত্য লাভ করে। শুধু সামরিক দক্ষতা নয়, কার্দি পেশোয়ার অন্যতম বিশ্বাসভাজনও ছিল। হঠাৎ পেশোয়ারের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়, স্মরণ হয় সেনাধ্যক্ষ কার্দি মন্ত্রণাকক্ষে অপেক্ষা করছে। মন্ত্রণাকক্ষের দিকে পা বাড়ালেন পেশোয়া।

পেশোয়াকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলো কার্দি। পেশোয়া তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার্দি বলল— মহামান্য পেশোয়জী একটা বিশেষ বার্তা নিয়ে আসতে হলো। আমরা আহমেদ শাহ আবদালির পুত্র তৈমুরকে পঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করে পঞ্জাব দখল করেছি। তাই ক্রুদ্ধ আহমদ শা এক বিশাল আফগান বাহিনী নিয়ে পঞ্জাব অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে।

— চিন্তার বিষয়। তাদের সৈন্য সংখ্যা কত?

— সৈন্য সংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু উদ্বেগের কারণ হলো তাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে গোলা-বারুদ, কামান, বন্দুক। যা আমাদের বাহিনীর নেই।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাল পোশায়াকে, কার্দির সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে কী তাঁর কর্তব্য। কার্দিকে বিশ্রাম কক্ষে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পেশোয়া ফিরে গেলেন শয়নকক্ষে। বিপদ আসন্ন, এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়, এমন বন্ধু কে আছে যে পাশে দাঁড়াবে? এই তো সেদিন তিনি মহীশূরের কিয়দংশ দখল করলেন? সদাশিব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা উদ্‌গরের যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করে বিজাপুর, ঔরঙ্গাবাদ ও বিদরের কিছু অংশ এবং দৌলতাবাদ দুর্গটি অধিকার করেন। রাজপুতানায় এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াবেও মারাঠা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লির বাদশাহরা পর্যন্ত মারাঠাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এইবার...। আফগান আবদালির সঙ্গে লক্ষাধিক সুশিক্ষিত সেনা, বন্দুক, গোলা বারুদ। মারাঠাদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু বন্দুক আর গোলাবারুদ নেই। আফগান ইব্রাহিম কার্দি অনেকবার গোলন্দাজ বাহিনী গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু হবে হবে করেও তা হয়ে ওঠেনি। এই আসন্ন আক্রমণে মারাঠাদের হাতে গোলাবারুদ থাকলে আর চিন্তার কিছু ছিল না। পারসিক আর আফগানরা ইউরোপ থেকে বারুদ আমদানি করে গোলন্দাজ বাহিনী তৈরি করেছে। তাই যুদ্ধে তারা অপ্রতিহত। এই প্রচণ্ড শীতের রাতেও পেশোয়ার কপালে দেখা গেল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

পরদিন প্রাতে পেশোয়া কার্দির সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনার পর মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করলেন প্রধান সেনাপতি সদাশিবরাও সহ অন্যান্য সেনাপতিদের। পেশোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র মাত্র সতেরো

With Best
Compliments from :-

Tel. : 0161-2555011
0161-2555111
Fax : 0161-2555163
Mob. : 98147-00163
98140-20479

BRM TOWER
Loha Mandi, Miller Ganj, Ludhiana-141 003.

ROHIT GUPTA
YASHPAUL GUPTA

Loha Mandi, Miller Ganj,
Ludhiana - 141 003

With Best Compliments from :-

UNISPARES

Manufacturers & Exporters

B-131, Face II, Noida, Dist. G. B. Nagar- 201 305

Uttar Pradesh, India

Mobile : 91-9810535620, Phone : 91-120-4219223, 4375262

Fax : 91-120-4274676

E-mail : pschauhan@unispare.com

www.unispares.com

বছরের বিশ্বাসরাও সদ্য এক ক্ষুদ্র বাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছে। পেশোয়া তাকেও ডেকে পাঠালেন। মারাঠা সেনানায়করা আহম্মদ শাহ আবদালিকে প্রতিরোধ করার জন্য সানন্দে স্বীকৃত হলো। কালবিলম্ব না করে পেশোয়া সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। সেনাপতি গণপত রাও আপত্তি করলেন সম্যক অবগত না হয়ে শুধুমাত্র কার্দির একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে এতবড় সিদ্ধান্ত নেওয়া কি উচিত হবে? সেনাধ্যক্ষদের কয়েকজন তার সঙ্গে সহমত পোষণ করল। পেশোয়া তাকালেন ইব্রাহিম কার্দির দিকে। কার্দি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—

— মহানুভব পেশোয়া, মান্যবর সেনাধ্যক্ষগণ, এই মহারাষ্ট্র আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, কাজ দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সামর্থ্য দিয়েছে। একজন মারাঠার মহারাষ্ট্রের প্রতি যতটা শ্রদ্ধা,

লেভেল ক্রসিং ব্যবহারকারীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

- রেল লাইনের কাছাকাছি থাকার সময়ে কখনোই মোবাইল ফোন/ইয়ারফোন ব্যবহার করবেন না।
- লেভেল ক্রসিং গেটে কখনো তাড়াহুড়ো করবেন না এবং আগত ট্রেনের সময়ে লাইন পারাপার করবেন না।
- লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ থাকলে আপনার গাড়ি থামান।
- গেট বন্ধ থাকলে জোর করে লাইন পারাপার করবেন না।

উন্নয়নমূলক উদ্যোগ

পূর্ব রেলওয়ে আরও বেশি সুরক্ষার জন্য রোড ওভারব্রিজ/ রোড আন্ডারব্রিজ নির্মাণ করে সকল লেভেল ক্রসিং গেট অপসারণের জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মনে রাখবেন

জোর করে বন্ধ লেভেল ক্রসিং গেট পার হওয়া রেলওয়ে আইনের অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

দায়িত্ববান নাগরিক হোন

পূর্ব রেলওয়ে

জাতির সেবায়

ভালোবাসা, কর্তব্য আমারও তার চেয়ে কম নয়। মহারাষ্ট্র জননীর নামে শপথ করে বলছি, ঘোর বিপদ আসন্ন। আজ সব ভেদাভেদ ভুলে মারাঠা জাতির একমাত্র কর্তব্য এই শত্রুর মোকাবিলা করা। বিপদ আসন্ন।

সেনানায়কগণ একযোগে বলে উঠল— সাধু, সাধু।

মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেরিয়ে সেনানায়কগণ আপন আপন শিবিরে ফিরে গেল। ইব্রাহিম কার্দিও এগিয়ে গেলেন অশ্বের দিকে। অশ্বারোহণের পূর্বে তার সামনে এসে দাঁড়াল এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক। রায়পুরে, পুণায় এইরকম ভিক্ষুক প্রায়ই দেখা যায়। শীতকাল, তাই গায়ে কম্বল ভিক্ষুকের। কম্বলের ভিতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ কার্দির হাতে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ভিক্ষুক। কার্দি ভাঁজ করা কাগজটি খুলল। পশ্তু ভাষায় লেখা একটি পত্র। একটি ছত্র মাত্র লেখা—

'গোদাবরীর ঘাটের পাশে পীরবাবার মাজারের পিছনে সন্ধ্যায় এসো।'

হস্তাক্ষর দেখে কার্দি বুঝতে পারে, পত্রটি মায়মুনা বেগমের লেখা। কিন্তু মায়মুনা এখানে এলো কোথা থেকে? মায়মুনাকে পিত্রালয়ে রেখে কার্দি কর্মের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। মাঝখানে কয়েকটি বছর কেটে গেছে। কার্দি কাফের মারাঠাদের অধীনে কর্মগ্রহণ করেছে শুনে মায়মুনা তাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করেছে। কার্দি দিল্লিতে গিয়েও মায়মুনাকে ফেরাতে পারেননি। মায়মুনার জেদ কার্দি কাফেরের কর্মত্যাগ করলে তবে সে কার্দির সঙ্গে সংসার করবে, নচেৎ নয়। কার্দি রাজি হননি, তার দুঃসময়ে এই পেশোয়া তাকে সসম্মানে সেনাপত্যে নিযুক্ত করেছেন। মারাঠারা তাকে স্নেহে মমতায় আপন করে নিয়েছে। তবে গণপতরাওয়ের মতো ধর্মান্ধ বিরোধী যে একেবারে নেই, তা নয়। এখন মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। মায়মুনা বেগম এই পুণায় কী করে এলো, কেন এলো, সে জবাব তখনই পাওয়া যাবে। কার্দি যখন মোগল বাহিনীতে কর্মরত, তখন আফগান হিং ব্যবসায়ী খোদা বক্সের কন্যা মায়মুনার সঙ্গে তার শাদি হয়। শাদির কিছুদিন পরেই কার্দি কর্মচ্যুত হয়। খোদা বক্স জামাতাকে হিঙের ব্যবসায় টানার চেষ্টা করে বিফল হয়।

আজীবন যুদ্ধ ব্যবসায়ী কার্দি হিঙের ব্যবসা প্রত্যাখ্যান করে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। কর্মপ্রাপ্তির পর পেশোয়ার অনুমতি নিয়ে দিল্লি আসে কার্দি মায়মুনাকে পুণায় নিয়ে যাবার জন্য। মায়মুনা তখন কার্দিকে কাফেরের অন্নভোজী বলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আজ সেই মায়মুনা বেগম হঠাৎ পুণায়!

শীতের সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি নেমেছে। গোদাবরীর ঘাটের পাশে পীরবাবার মাজারের পেছনে দাঁড়িয়েছিল সশস্ত্র ইব্রাহিম কার্দি। মায়মুনা বেগমের পত্র পাওয়ার পর থেকে তার মনে স্বস্তি নেই। কেন এলো মায়মুনা, যে একদিন স্বেচ্ছায় তাকে ত্যাগ করেছিল। মায়মুনার সঙ্গে মাত্র দু-বছর সংসার করেছিল কার্দি। তার মধ্যেই একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের। দুটি বিশেষ গুণ ছিল মায়মুনার। এক ভালো খানা পাকাতে পারত। আর অপূর্ব কণ্ঠ ছিল, ভালো গান গাইতে পারত। রুবাব বাজাতে পারত। সেই দু-বছরের সংসার যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় কার্দির। কার্দির শ্বশুর খোদা বক্স লোকটা ছিল ধর্মান্ধ। গান, বাজনা পছন্দ করত না। কারণ, গান-বাজনা ইসলাম বিরোধী। তবুও মায়মুনা লুকিয়ে গান করত, রুবাব বাজাত। এর মধ্যেও মায়মুনা পিতার একটা গুণ পেয়েছিল ধর্মান্ধতা। যার ফলে হিন্দু মারাঠাদের সেনাদলে কাজ নিয়েছে বলে স্বামীকে ত্যাগ করতেও মায়মুনা দ্বিধা করেনি। হিঙের বেওসাদার খোদা বক্স তাতে মদত দিয়েছিল।

হঠাৎ একটা তানজাম্ এসে দাঁড়াল কার্দির পাশে। তানজাম-এর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো একটা মুখ, কার্দি দেখল সেই মুখ মায়মুনার।

মায়মুনা বলল— যদি আমার প্রতি এখনও প্যার-মহব্বত থাকে তবে তানজামের পেছন পেছন এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কার্দি তানজামকে অনুসরণ করে মৃদুগতিতে অশ্বচালনা করল। তানজাম নগর অতিক্রম করে প্রবেশ করল বাঈজী পল্লিতে। ঘরে ঘরে জ্বলছে বাহারি আলো, আতর আর অম্বুরি তামাকের গন্ধে ম-ম করছে শীতের সন্ধ্যার বাতাস। এক দো-মহলা বাড়ির সামনে তানজাম রাখা হলো। তানজাম থেকে নমে এলো মায়মুনা, পোশাকে, অলংকারে ঝলমল করছে। মৃদু স্বরে আহ্বান করল কার্দিকে।

— এসো।

অশ্বটি এক অশোক গাছের সঙ্গে বেঁধে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মায়মুনাকে অনুসরণ করল কার্দি। কয়েকটি ঘর পেরিয়ে এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করল মায়মুনা, পেছনে কার্দি। মায়মুনা বলল

— বসো।

এক নরম মখমলের আসনে উপবেশন করল কার্দি। একটা হালকা পোশাক পরে কাছে এসে বসলো মায়মুনা। আগের থেকে সে আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে।

— কী মনে আছে আমাকে, না একেবারে ভুলে গেছো?

— তোমাকে কোনোদিন ভুলতে পারি? তুমি আমাকে স্বেচ্ছায় দূরে ঠেলে দিয়েছ, কিন্তু আমার মনে তুমি চিরজাগ্রত। আমার দিমাগ বলছিল তুমি একদিন ইয়াদ করবে, তোমার কাছে ডাকবে আমাকে।

— তোমাকে বিদায় দিয়ে দিনের পর

With Best Compliments
from

P. C. CHANDRA®
J E W E L L E R S

A jewel of jewels

pcchandraindia.com | amazon | GET IT ON Google Play Download Now

Follow us on /pcchandrajewellersindia

+918010700400 (Except Sunday)

OUR SHOWROOMS

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Golpark | Barasat | Behala | Arambagh
Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda | Purulia | Siliguri
Siuri | Tamluk | Agartala

ALL THE BELOW MENTIONED SHOWROOMS WILL REMAIN OPEN ON SUNDAYS

Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara
Baruipur | Barrackpore | Asansol Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj | Delhi
Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai | Ranchi

দিন আমি কী যন্ত্রণায় কাটিয়েছি, তোমাকে সমঝাতে পারবো না। কত খুঁজেছি তোমাকে সারা হিন্দুস্থানে। আব্বা হুজুরের ইন্তেকাল হয়েছে। আয়ুধে হাবেলি কিনেছি। তুমি চলো আমার সঙ্গে, আয়ুধে আমার শূন্য হাবেলিতে। আব্বাহুজুর আমাকে অনেক বাদশাহী মোহর দিয়ে গেছে, যা গুণে শেষ করা যাবে না। তুমি সে সবের মালিক হও, আমি তোমার কাছে এসেছি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

— তুমি এখানে আমার কাছে থাকো। পেশোয়াকে বললে এখানে হাবেলির ব্যবস্থা করে দেবেন।

— না, জানে মন, কাফের মারাঠাদের কোনো সাহায্য আমি নেবো না। তুমি আমার সঙ্গে আয়ুধে চলো। নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে বলে আমি তোমাকে সেনাপতির পদ পাইয়ে দেব। নবাব সাহেব আমাকে যথেষ্ট খাতির করেন।

একটা
গোপন কথা বলি
আফগান আমির আহম্মদ শা
আবদালি হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে
আসছে, তাঁকে মদত করবে আয়ুধের

নবাব সুজা-উদ্-দৌলা আর রোহিলা নবাব নজীব উদ-দৌলা। এই যুদ্ধে মারাঠারা শেষ। তোমার মতো বীর সাহসী ইমানদার যোদ্ধার কদর নবাব সুজা করবেন। তুমি চলো।

— মায়মুনা বেগম, আমার দুর্দিনে মারাঠারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, নৌকরি দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, এই দুর্দিনে তাদের ছেড়ে যাওয়া বেইমানি, এই বেইমানি আমি করতে পারবো না।

— কাফেরদের সঙ্গে কিসের ইমানদারি? চলো, তুমি মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ করবে আয়ুধের নবাবের পক্ষে।

— না, মায়মুনা না, ইমান আমি ভাঙ্গতে পারব না।

— আমার জন্যও না?

— না, হিন্দুস্থানের বাদশাহী পদের জন্যও না।

— তবে তুমি বন্দি থাকো এই হাবেলিতে।

মায়মুনা হাততালি দিতেই জনা চারেক হাব্সি খোজা এসে কার্দিকে কবজা করার চেষ্টা করে। তড়িৎ গতিতে তরবারি কোষমুক্ত করে হাব্সি চারজনকে কোণঠাসা করে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে কার্দি। কিন্তু কোথায় অশ্ব? যে গাছের সঙ্গে অশ্ব বাঁধা ছিল সেখানে নেই। ততক্ষণে খোজা চারজন সশস্ত্র হয়ে কার্দিকে তাড়া করেছে। কার্দিও তখন প্রাণপণে ছুটে চলেছে, রাস্তার ধারে একটা টাঙ্গার আড্ডা, গাড়োয়ানরা এক জায়গায় বসে মজলিশ করছে। কার্দি, একটা টাঙ্গায় চড়ে বসে ক্ষিপ্র হাতে টাঙ্গা হাঁকিয়ে দিল। গাড়োয়ানরা টের পেয়ে হৈ-হুল্লো করে উঠল। টাঙ্গা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নগরের মাঝামাঝি এসে কার্দি রাস্তার পাশে টাঙ্গাটি দাঁড় করিয়ে নেমে এল। পেছনে কারও দেখা নেই। না খোজাদের না গাড়োয়ানদের। নিশ্চিন্ত হয়ে কার্দি পা বাড়াল পেশোয়া বালাজী বাজিরাওয়ের প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদদ্বারে রক্ষীরা পথ আটকালো। কার্দি পাঞ্জা দেখাতে রক্ষীরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। আবার সেই মন্ত্রণা কক্ষ। পেশোয়া জিজ্ঞাসা করলেন—

— কী সংবাদ ইব্রাহিম তোমাকে এত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন?

— মহামান্য পেশোয়াজী, সে অনেক কথা। আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পেশ করছি। আহম্মদ শাহ আবদালি একা নয়, হিন্দুস্থানের দুই নবাব, আয়ুধের নবাব সুজা-উদ-দৌলা এবং রোহিলার নবাব নজীব-উদ্-দৌলা আবদালিকে সবরকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

ইব্রাহিম তোমাকে আমি নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করি। তবুও জানতে কৌতূহল হয়। এই সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ইব্রাহিম কার্দি মাথা তুলে বলল—

— মহামান্য পেশোয়া। আমার বেগম মায়মুনার কাছে। সে আমার খোঁজে পুণায় এসেছে। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎও হয়েছে। সে আয়ুধের নবাব সুজা-উদ্-দৌলার আশ্রিতা। আমাকে আয়ুধে নিয়ে গিয়ে সেনাপত্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি গ্রহণ করিনি, তখন সে আমাকে বন্দি করতে চেয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি।

— সে কোথায় আছে এখন?

— মহাত্মন, সে এখন পুণার শেষ প্রান্তে বাঈজী মহল্লায়।

— ইব্রাহিম কার্দি। নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি একদিন আমাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলে। তুমি মারাঠা বাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধে পারদর্শী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। দু-একজন ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষী ছাড়া সমগ্র মারাঠা জাতি তোমাকে বন্ধু মনে করে। আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই। এই উপহার গ্রহণ করতে তুমি আপত্তি করো না।

— মহাত্মন, সেই উপহার যদি আমার ইমান আর পৌরুষের পরিপন্থী না হয় তবে তা আমার শিরোধার্য।

— আমি তোমার স্ত্রী, সংসার ফিরিয়ে দিতে চাই ইব্রাহিম। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করো। আমি তোমাকে আলাদা হাবেলি দিচ্ছি।

— গোস্তাকি মাফ করবেন মহাত্মন। আমি নিজেই সেই প্রস্তাব তাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তাতে রাজি নয়। সে আমাকে আয়ুধে নিয়ে গিয়ে নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সেনাপতি করবে।

— ইব্রাহিম! তুমি মারাঠা বাহিনীর সম্পদ। আগামী যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী তোমার মুখ চেয়ে আছে। তবুও আমি বলছি, তোমার সুখ, শান্তি, পরিবারের কল্যাণের জন্য তুমি তোমার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হও। স্ত্রীর সঙ্গে চলে যাও আযোধ্যায়। সেনাপতি হও, সুখী হও। আমি তোমাকে অযোধ্যায় যাবার অনুমতি দিলাম। আর যাবার সব ব্যবস্থাও আমি করে দেবো। যাও, চলে যাও।

— গোস্তাকি মাফ করবেন মহাত্মন। আপনার এই প্রস্তাব আমি মানতে পারলাম না। নিজের স্বার্থে, নিজের সুখ শান্তির জন্য, আমার অসময়ের আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, মর্যাদাদাতা মারাঠা জাতির আসন্ন বিপদের সময় পালিয়ে যাবো, এতবড় বেইমান এই আফগান ইব্রাহিম কার্দি নয়। জয়-পরাজয় যাই হোক, আমি মারাঠা জতির হয়ে স্বজাতি আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।

— ধন্য, ইব্রাহিম তুমি ধন্য।

— আমাকে আরেকবার বাঈজী মহল্লায় যাবার অনুমতি দেবেন মহাত্মন? আমাকে আটকানোর জন্য ওরা আমার অশ্ব চুরি করেছে। বাধ্য হয়ে আমি টাঙ্গার আড্ডা থেকে একটা টাঙ্গা চুরি করে পালিয়ে আসি। সেই টাঙ্গা ফেরত দিয়ে

আমার অশ্বটি উদ্ধার করতে হবে।

— যাও, তবে একা নয়, সৈন্য নিয়ে যাও।

ইব্রাহিম কুর্নিশ করে মন্ত্রণা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল তখন মধ্যরাত্রি।

আবদালির বাহিনীর ক্রমশ এগিয়ে আসছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা আর রোহিলার নবাব নজীব উদ্ দৌলা। পাণিপথের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেছে মারাঠারাও। কার্দির চেষ্টায় সামান্য গোলা-বারুদও জোগাড় হয়েছে। এক ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনীও তৈরি হয়েছে। পেশোয়া বালাজী বাজীরাও আশপাশের হিন্দু রাজাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে দূত পাঠিয়েছেন। দূত পাঠিয়েছেন রাজপুত ও জাঠ সর্দারদের কাছেও। মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে তার বাহিনী নিয়ে এই যুদ্ধে যোগদান করবেন কিনা সন্দেহ। ইব্রাহিম কার্দির চেষ্টার বিরাম নেই। আফগান যোদ্ধাদের প্রতিহত করার কৌশল অনবরত শিখিয়ে যাচ্ছে অধীনস্থ সেনাদের। সামান্য গোলাবারুদের সঙ্গে গুটিকয়েক কামানও জোগাড় হয়েছে। কিন্তু গোলন্দাজিতে পারঙ্গম একমাত্র কার্দি, উৎসাহী কয়েকজন মারাঠী সেনাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। পেশোয়া ছাড়াও প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও ভাও কার্দির তৎপরতায় খুব খুশি। পেশোয়ার পুত্র নবীন সেনাধ্যক্ষ বিশ্বাস রাও কার্দির একান্ত অনুগত।

অবশেষে এল সেই দিন, ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি। বিশাল আফগান বাহিনী নিয়ে আহম্মদ শাহ আবদালি পানিপথের প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারাঠাদের উপর। সঙ্গে অযোধ্যা আর রোহিলার নবাবের বাহিনী। মারাঠাদের পক্ষ থেকেও প্রাণান্তকর প্রতিরোধ করা হলো। কিন্তু আফগান বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে মারাঠা বাহিনী বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। কার্দির সংগৃহীত গোলাবারুদ নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। শুধুমাত্র বর্শা আর তলোয়ার নিয়ে এই অসম যুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যে মারাঠাবাহিনী বিধ্বস্ত হলো। প্রধান সেনাপতি সদাশিবরাও, পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাস রাও সহ বাইশজন প্রথম শ্রেণীর সেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণ হারান। পুণায় পেশোয়ার কাছে এই দুঃসংবাদ যে ক্ষুদ্র বার্তাটিতে পাঠানো হলো তা হল— 'দুটি মুক্তা নষ্ট হয়েছে, বাইশটি সোনার মোহর খোয়া গেছে, আর সোনা রূপা কত যে ক্ষয় হয়েছে তা গণ্য করা অসম্ভব।' মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লক্ষাধিক মারাঠা সৈন্য প্রাণ হারায়। ইব্রাহিম কার্দি গুরুতর আহত হয়ে আফগান বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। সুজা-উদ-দৌলার নির্দেশে তাকে পাণিপথ প্রান্তরে মায়মুনা বেগমের শিবিরে পাঠানো হয়। পথিমধ্যে এক আফগান সৈনিক কার্দিকে পঞ্জাব যুদ্ধে তাঁর ভ্রাতৃহন্তা বলে সনাক্ত করে এবং প্রচণ্ড আক্রোশে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে। ইব্রাহিম কার্দির প্রাণহীন দেহ মায়মুনার কাছে পাঠানো হয়। অনেক প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিল মায়মুনা, স্বামীকে সুস্থ করে চলে যাবে অনেক দূরে, যেখানে যুদ্ধ নেই, রক্তপাত নেই, তার কৃতকর্মের জন্য মাফ চেয়ে নেবে কসম এর কাছে। দিলওয়ালা আদমি ইব্রাহিম তাকে নিশ্চয় আর দূরে সরিয়ে দেবে না। মায়মুনার সামনে রাখা হলো কসমের নিথর দেহ। মায়মুনার মুখে ভাষা নেই। চোখে জল নেই। দীর্ঘ প্রত্যাশার এই করুণ পরিণতিতে পাষাণ হয়ে গেল মায়মুনা। ■

With Best Compliments from :-

A

WELL WISHER

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2241379 - 2240310

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com